শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের
স্মৃতিকথা

7/50

Girindra mohan Bhattacharyy

Varanasi

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

প্রথম ভাগ

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
বারাসত
(২৪ পরগণা)

প্রকাশক :
রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
পোঃ বারাসত, চব্বিশ পরগণা

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৭

পরিবেশক :

১। রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসত, (২৪ পরগণা)
ও
উক্ত আশ্রমের কলিকাতা কার্য্যালয়, ৭নং রজনী সেন রোড, কলিকাতা-২৬
২। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩
৩। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪
৪। জেনারেল্ বুক্ ষ্টল্, এ ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট্, কলিকাতা-১২
৫। শ্রীকানাইলাল মিত্র, ২০নং মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪
৬। শ্রীইন্দুভূষণ দে, ৮।১ এ, বিপিন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর :
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য : আড়াই টাকা

নিবেদন

পরমেশ্বরের অশেষ কৃপায় "শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। বিভিন্ন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতেন তাহার কিয়দংশ ভক্তগণের নিকট সুরক্ষিত ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভক্ত বিনাসর্ত্তে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী শ্রীঅমূল্য বন্ধু মুখোপাধ্যায়, হাওড়া নিবাসী শ্রীসুধীর চন্দ্র বিশ্বাস এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, এই তিন জন ভক্তের লেখা এই ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুরূপ আরও যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অতঃপর যদি কোন ভক্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতিকথা আমাদিগকে প্রদান করেন, সেগুলিও উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়াবতী (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া এবং শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এই পুস্তকের মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত যথেষ্ঠ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ শ্রীঅমূল্য বন্ধু মুখোপাধ্যায় তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে পাঁচশত টাকা এবং শ্রীকানাইলাল ঘোষ, প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী এইচ্. কে. ঘোষ এণ্ড কোং-র স্বত্ত্বাধিকারিগণ, শ্রীহরষিত সেনগুপ্ত প্রমুখ কতিপয় সহৃদয় ভক্ত সাধ্যমত অর্থ সাহায্য

করিয়াছেন—তদ্দারা পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকের নিকট হইতে আমরা এবিষয়ে উৎসাহ, পরামর্শ, ও সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। এই পুস্তকের কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে মাসিক বেদান্তকেশরী ও উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকাগুলির কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক বিনাসর্ত্তে আমাদিগকে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্নভাবে যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশে আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং শ্রীভগবতচরণে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র এবং বারাসত তীর্থ-বন্দনা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। এই গ্রন্থখানি সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়া পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ে ভগদ্ভাব সম্ফুরণে সমর্থ হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া গেল—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জনীয়।

এই পুস্তকের সমগ্র আয় বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইতি—

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
পোঃ বারাসত, (২৪ পরগণা)
শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের
১০৫তম জন্মতিথি
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭, বুধবার।

বিনীত
প্রকাশক
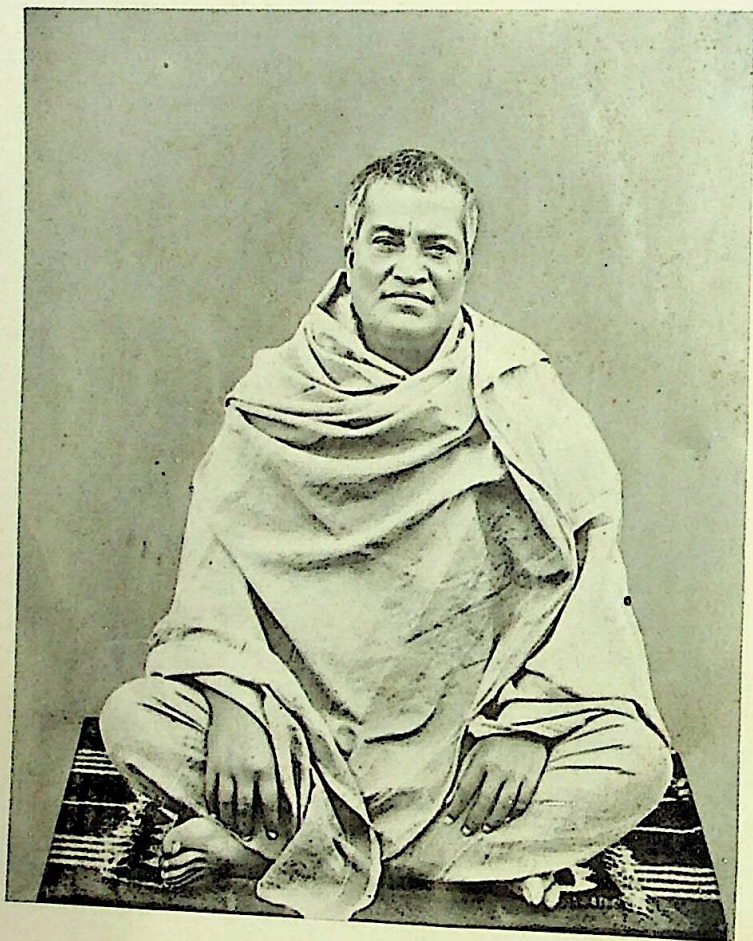
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ এবং অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তরূপে যে কয়জন মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সহস্র সহস্র নরনারীর অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শকরূপে এক গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত ছিল। ইহার উপর আবার বর্ত্তমান জটিল সমাজজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে যুগাবতারের বাণীকে ভক্তকণ্ঠে বিঘোষিত করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাকে রূপায়িত করার দায়িত্বও তাঁহার ছিল। অধিকন্তু স্বীয় কার্য্যকলাপ এবং আলাপ-আলোচনায় আদর্শ ভাগবত জীবনের মর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে উদ্ঘাটনের কর্ত্তব্যভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সব দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয় এই জীবনের মূল্য খুবই বেশী।

ভারতের পরমহংস পরিব্রাজকগণ স্বীয় জন্মাদির তিথি প্রভৃতিকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দও তাঁহার জন্মদিবস প্রভৃতি সঠিক স্মরণ করিতে পারিতেন না। তথাপি তাঁহার বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের গণনা সাহায্যে অনুমান করা চলে, তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২রা অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর) চান্দ্র কার্ত্তিক, কৃষ্ণা একাদশী তিথি, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টা ১০ মিনিটে মাতৃক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া, জেলা চব্বিশ পরগণার

অন্তর্গত বারাসত শহরে স্বীয় পিতৃগৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষাল মোক্তারি করিতেন এবং এই সূত্রে রাণী রাসমণির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বামাসুন্দরী দেবী দীর্ঘকাল পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া ৺তারকনাথ মহাদেবের শরণাপন্ন হন এবং ব্রত, উপবাস ও পুরশ্চরণাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধনে যত্নপর হন। অবশেষে মহাদেব একরাত্রে বামাসুন্দরী দেবীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তোমাদের ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; তুমি সুপুত্রের জননী হইবে।" তাই তারকেশ্বরের কৃপায় লব্ধ চারুদর্শন, সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্রের নাম হইল তারকনাথ, আর তাঁহার আদরের ডাক-নাম হইল "ফুনু"। জ্যোতিষী জন্মপত্রিকা রচনা করিয়া জানাইলেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে নবজাতকের সন্ন্যাসযোগ রহিয়াছে, অন্যথা তিনি রাজসম্মানের অধিকারী হইবেন। আমরা দেখিব এই উভয় ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইয়াছিল।

দেবীভক্ত ঘোষাল মহাশয় তন্ত্রমতে স্বগৃহে পঞ্চমুণ্ডী আসন সাজাইয়া নিয়মিত উপাসনা করিতেন এবং দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। পঁচিশ-ত্রিশটি বিদ্যার্থী তাঁহার অন্নে তাঁহারই গৃহে প্রতিপালিত হইত। তারকনাথ ছিলেন যেন ইহাদেরই একটি। প্রতিবেশিনী কেহ যখন মাতার নিকট অভিযোগ করিতেন, "ছেলেটাকে একটু আদর-যত্নও করছে না", তখন ভক্তিমতী বামাসুন্দরী বলিতেন, "তাঁর (অর্থাৎ ৺তারকনাথের) ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন, তিনিই দেখবেন।" সাধক ঘোষাল মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরেও যাইতেন। ঐ সূত্রে

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ঘোষাল মহাশয়ের চেহারা ছিল সুদীর্ঘ এবং সুগঠিত। গায়ের গৌরবর্ণ, বুকের লালিমা, এবং পরণের লালচেলি ইত্যাদি মিলিয়া সহজেই তাঁহার প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; মনে হইত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। তিনি ধ্যানে বসিলে সঙ্গী গায়ক দেহতত্ত্ব ও শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত শুনাইতেন, আর সাধকের দুইচক্ষে অশ্রু বিগলিত হইত। সাধনকালে ঠাকুরের দেহে যখন অসহ্য দাহ উপস্থিত হয়, তখন ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে ইষ্টকবচ ধারণ করিতে উপদেশ দেন এবং ইহাতে সুফল লাভ হয়। এইসব কথা ঠাকুরের স্মরণ ছিল, তাই উত্তরকালে তারকনাথ যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন, তখন পরিচয় পাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "বটে! তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ... তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো।" আর বলিয়াছিলেন, "তোকে প্রথমে দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক।"

সাধক পিতা ও ধর্ম্মপ্রাণা জননীর একমাত্র আদরের দুলাল তারকনাথ ক্ষুদ্র শহরের গ্রামোচিত আবেষ্টনীর মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। বিদ্যাধ্যয়নের জন্য তিনি প্রথমে মিশনারীদের স্কুলে ভর্ত্তি হন; কিন্তু পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া অনেকেই আনন্দ পাইতেন। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংসারকে দুঃখে ভাসাইয়া তারকনাথের প্রায় নয় বৎসর বয়সে তাঁহার জননী একটি তিন মাসের কন্যা নীরদাকে রাখিয়া

পরলোকগমন করিলেন। বালকের কোমল প্রাণ ইহাতে নিদারুণ পীড়িত হইলেও তিনি ক্ষুদ্র ভগিনীর লালন-পালনে মন দিয়া সে শোক কথঞ্চিৎ ভুলিতে পারিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিলে বিমাতাই কন্যার ভার লইলেন।

সুখে-দুঃখে জীবন একরূপ চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু পরিবারে হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় ঘটিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়ায় তারকনাথের জীবনসংশয় হইয়াছিল এবং আরোগ্যলাভের পরও তাঁহাকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রায় এক বৎসর বাহিরে কাটাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া পুনঃ পাঠ আরম্ভ করার কিছু পরেই তাঁহার দিদি চণ্ডী দেবী দেহত্যাগ করিলেন এবং ভগিনী ক্ষীরোদাও বালবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। হয়তো এইসব ঘটনা-পরম্পরা ভাবী মহাপুরুষের হৃদয়ের সুপ্ত বৈরাগ্যকে উদ্দীপিত করিল। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে থাকাকালেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসের ডাক আসে নাই; তিনি স্বাবলম্বী হইবার জন্য উত্তরভারতে রেলবিভাগে চাকরী লইলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না, প্রাণে ধর্ম্মভাবও ছিল; আর কখন বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না—এভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশভ্রমণ করব, নানা তীর্থ দেখে বেড়াব—এই ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল। রেলে চাকরী করতাম, আর ভগবানকে ডাকতাম।" এই অল্প কয়টি কথায় তাঁহার তৎকালীন মনোভাব সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। চাকরীর সঙ্গে এই নিভৃত উচ্চচিন্তা, এমনকি সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

এইভাবেই মোগলসরাইয়ে তিনি একদিন তাঁহার সঙ্গী প্রসন্নবাবুর নিকট দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাইলেন। প্রসন্নবাবু বলিলেন, সমাধি সহজলভ্য নহে। তেমন সমাধিবান্ লোক একমাত্র আছেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব। শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তারকনাথ লালায়িত রহিলেন।

মন যখন এমনি উর্দ্ধগামী তখন পিতার নিকট হইতে অকস্মাৎ প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বামাসুন্দরী দেবীর দেহত্যাগের পরই ঘোষাল পরিবারে অসচ্ছলতা দেখা দেয়। আলোচ্য সময়ে অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে, তারকের ভগিনী নীরদাকে যে পরিবারে বিবাহ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে, সেই পরিবারের একটি কন্যাকে তারক বধূরূপে গ্রহণ না করিলে নীরদার বিবাহ হওয়াই অসম্ভব। মাতৃহীনা স্নেহের পুত্তলি এই ভগিনীটিকে তিনি কত যত্নে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি কি তারকনাথের কোন কর্ত্তব্য নাই? অতএব বিবাহস্পৃহা না থাকিলেও অনেক ভাবিয়া তিনি সম্মত হইলেন। ঘোষাল-পরিবারে বধূরূপে আসিলেন মহেশ্বরপুর গ্রামের ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দেবী।

ইতিমধ্যে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি অফিসে কাজ লইয়া তারকনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন। ঐ বাটীটি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের 'লিলি কটেজে'র নিকটে থাকায় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না। তিনি অবসরকালে আরও গভীরভাবে অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট রহিলেন।

বারাসতে অবস্থিতা নিত্যকালী দেবীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনও সাংসারিক সম্পর্ক স্বীকার করিতে তাঁহার মন স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে তাঁহাদের কলিকাতার বাসস্থান সিমলা-পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহের নিকট উঠিয়া আসিলে রামচন্দ্রের গৃহে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইলেন। ইহা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকের ঘটনা।

প্রথম দর্শনেই তারকনাথের মনে ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ উপস্থিত হইল এবং শীঘ্রই তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। ভাবঘনমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার জননী আজ শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত। অতঃপর তিনি ঠাকুরকে জগজ্জননীরূপেই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত মনে মনে ঐরূপ সম্বন্ধই পোষণ করিতেন। বলা বাহুল্য অতঃপর দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ হইল। ইহা ছাড়া রামবাবুর বাড়ি প্রভৃতি স্থানেও ঠাকুরের সাক্ষাৎলাভ হইত। মায়ের ভালবাসাকেই সম্বল করিয়া সন্তান যেমন তাঁহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকে, তারকনাথও তেমনি ঠাকুরের ভালবাসাতেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যে ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই তাঁর কাছে ছিলাম।" তিনি ঠাকুরের কাছে গোপনে আসিতেন; নীরবে দক্ষিণেশ্বরে কাল কাটাইয়া তেমনি আপন মনে ফিরিয়া যাইতেন। অতএব দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি ঘটনাপূর্ণ না হইলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে

ভরপুর। বিশেষতঃ ঐকালের দুই একখানি চিত্র অতীব চিত্তাকর্ষক।

একদিন 'কথামৃত'কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। অন্যদিন ঠাকুর স্বীয় শ্রীচরণ তারকের বুকে রাখিবামাত্র তারক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে তিনি দেখিলেন ঠাকুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "মা, নেমে এস, নেমে এস।" তারক ভগবদ্ভাবে কাঁদিতেন। ঠাকুরও বলিতেন, "গ্যাখ্, ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়—জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।" একদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুরকে ঐদিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার এমন কান্না পাইল এবং বুকের ভিতর এমন গুড়গুড় করিয়া উঠিল ও দেহকম্প আরম্ভ হইল যে আর থামে না। বস্তুতঃ, "অপরের কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগাইয়া দেওয়া যেন ঠাকুরের মুঠোর মধ্যে ছিল।" অপরের দেবদেবীর মূর্ত্তিদর্শন হয়, তাই তারকনাথেরও সে আগ্রহ হওয়ায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "হবে রে হবে—এত উতলা হচ্ছিস কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে তোর মূর্ত্তিদর্শন এখন হবে না, পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।" তারপর একদিন ঠাকুর অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার জিহ্বায় কি লিখিয়া দিলেন; তারক বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইয়া ঠাকুর তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু সে নেশা তারকনাথের মনে অনেকদিন রহিয়া গেল। আর একদিন

তারকনাথ ৺কালীমন্দির হইতে আসিতেছেন দেখিয়া দূর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর অপর একজনকে বলিয়াছিলেন, "তারকের উচ্চ শক্তির ঘর, যেখান থেকে নামরূপের উৎপত্তি হচ্ছে।"

একদিকে যুগাবতারের সান্নিধ্য ও স্বীয় স্বাভাবিক ভাগবত জীবনের আকাঙ্ক্ষার ফলে সংসারে বিরক্তি এবং অপরদিকে নববিবাহিতা পত্নী ও সংসারের কর্ত্তব্য—এই উভয় দ্বন্দ্বে দিশেহারা হইয়া একদিন তারকনাথ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে অফিসের কাগজপত্র ইতস্ততঃ ফেলিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কিরে—আমি আছি! স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি? একটু ধৈর্য্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি; আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি—তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।" ঠাকুরের এই আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলিয়াছিলেন যে, বিবাহিত জীবনে সম্পূর্ণ কামজিৎ হওয়া একমাত্র ঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। তখন তারকনাথ বলিলেন যে, ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার জীবনেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। তখন স্বামীজী বলিলেন, "তবে তো মশায় আপনি মহাপুরুষ।" তদবধি তিনি "মহাপুরুষ" নামে পরিচিত হন। ইহা অনেক পরের ঘটনা। আলোচ্যকালে ঠাকুরের ঐ আশ্বাসপ্রদানের কিছুকাল পরেই নিত্যকালী দেবী ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। তখন মুক্তবন্ধন তারকনাথ পিতাকে সংসারত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার

ভগবান লাভ হোক! আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু পারি নি। তাই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি তোমার ভগবান লাভ হোক।" ঠাকুরের প্রথম সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সন্তান তারকনাথ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর রামবাবুর বাড়িতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া তারককে বলিলেন, "দ্যাখ্, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—তাদের অন্নটা খাস্‌নি। আর সব খাবি।" ঐ সময়ের আহার সম্বন্ধে মহাপুরুষজী নিজে বলিয়াছেন, "অধিকাংশ দিনই একাহার, তাও হবিষ্যান্ন। কখনও বা আলু বেগুন বা যা হয় কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে দুটি খেয়ে নিতাম। দেহের আরামের জন্য সময় দিতে আদৌ ইচ্ছা হত না।" ঐ বাড়ীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূশয্যায় এইভাবে কিছুদিন কাটাইয়া অতঃপর কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেখানে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। আমগাছ-তলায় ধুনির পার্শ্বে দিনরাত ধ্যানজপে কাটাইতেন, একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত।

কাঁকুড়গাছি হইতে তিনি একবার বৃন্দাবনদর্শনে যান (১৮৮৪ খ্রীঃ) এবং ব্রজের রজঃ, তিলকমাটি ও প্রসাদী ছোলাভাজা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন। এইভাবেই দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে বাস করিতে থাকিলে এবং সেবার জন্য যুবক ভক্তবৃন্দ সেখানে তাঁহার পদপ্রান্তে মিলিত হইলে তারকনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সহিত মিলিত হইয়া তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা ও পূর্ব্বের ন্যায় তপস্যাদি করিতেন। একবার নরেন্দ্রনাথ ও

কালী মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দের) সহিত তিনি বুদ্ধগয়ায় যান। বোধিদ্রুমতলে যখন তিন জনে ধ্যানে মগ্ন তখন নরেন্দ্রনাথের মনে অকস্মাৎ বুদ্ধদেবের অপার করুণার কথা জাগ্রত হওয়ায় তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তারকনাথকে জড়াইয়া ধরেন। স্বামী অভেদানন্দজী বলেন, তিনি নরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছেন, "বুদ্ধমূর্ত্তি থেকে··· তারকদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতিঃ বের হয়ে গেল।" এই কথার উল্লেখ করিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলিয়াছিলেন, "সেখানে তো লোরেন ভাই তারকদাদার দেহে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করতে দেখেছিল।" যাহা হউক, তিন-চারি দিন পরে তাঁহারা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে ঠাকুর যেদিন একাদশ জন ভাবী ত্যাগী সন্তানকে গেরুয়াবস্ত্র দান করেন, তারকও সেদিন উহার একখানি পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ক্রমে কাশীপুরের সুখের দিন ফুরাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের দানে ও নরেন্দ্রনাথের উদ্যমে বরাহনগরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইলে মহাপুরুষজী উহার অন্যতম প্রথম অধিবাসিরূপে কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনান্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। এই মঠে থাকাকালেই গুরুভ্রাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তারকনাথের নাম হইল স্বামী শিবানন্দ। এই মঠে বাসকালেও তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই তীর্থদর্শনে যাইতেন। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে তাঁহার ভ্রমণের সুযোগ হইয়াছিল। একবার ঠাকুরের জন্মভূমি শ্রীধাম কামারপুকুরও দেখিয়া আসেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মঠ আলামবাজারে স্থানান্তরিত হয়। ইহার পরও তিনি প্রতিবৎসর তীর্থদর্শনে বাহির হইতেন।

এই তীর্থদর্শন কিন্তু নিছক ভ্রমণে পরিণত হইত না। এই সুযোগে তিনি কোথাও কোথাও দীর্ঘকাল থাকিয়া তপস্যা করিতেন। এই সম্বন্ধে পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশি থাকত না।...কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে।...এখন দুপা চলতে কষ্ট হয়। অথচ এই শরীর এই পা-ই তো কত পাহাড় পর্ব্বত চলে বেড়িয়েছে—কত কঠোর করেছে!" তীর্থ-ভ্রমণ ও তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার করিতেও ভুলিতেন না। এইভাবে আলমোড়ায় তপস্যাকালে (১৮৯২ খ্রীঃ) শ্রীযুক্ত ই. টি. ষ্টার্ডি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে আকৃষ্ট হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রচারের সংবাদ পাইয়া আমেরিকা হইতে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "তারকদা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে।"

স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার আদেশে সিংহলে প্রচারের জন্য যান এবং সাত-আট মাস সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া মঠে ফিরেন। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে। স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মহাপুরুষজী তাঁহার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কাশীধামে উপস্থিত হইলে তিনিও সেখানে মিলিত হন। কাশীতে মঠস্থাপনের জন্য ভিঙ্গার রাজা ৫০০৲ দান করেন। বেলুড়ে ফিরিয়া ঐ কার্য্যসম্পাদনের জন্য স্বামীজী মহাপুরুষজীকে কাশীতে পাঠান। সেখানে থাকিয়াই তিনি খবর পান যে স্বামীজী ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন (৪ঠা জুলাই, ১৯০২)।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দের জীবন একটি একটানা তপস্যার জীবন। ইহাতে যে উচ্চ-নীচতা ছিল তাহা তপস্যারই উগ্রতা ও অনুগ্রতা। তবে সব সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না। যে কয়খানি চিত্র পাওয়া যায় তাহার সব কয়খানিই অপূর্ব্ব। আমরা কাঁকুড়গাছি জীবনের কথা লিখিয়াছি। আলমোড়ায়ও তাঁহার জীবন ঐ ভাবেই ব্যয়িত হয়। সম্প্রতি আমরা কাশীর কথা লিখিতেছি। ভিঙ্গার রাজার সামান্য টাকায় আর কতদিন চলে? কিন্তু স্বামীজীর আদেশপালনের জন্য তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও ১৯০২ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে কাশীতেই কাটাইয়াছিলেন। ঠাকুরঘরে তিনি ঠাকুর ও স্বামীজীর আলেখ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজা করিতেন। কাশীর দুর্জ্জয় শীতে শীতবস্ত্রের অভাবে ধুনির পার্শ্বে ব্যাঘ্রাজিনের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইতেন; আবার রাত্রি ৩টায় উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন। ইহারই মধ্যে তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হিন্দী পুস্তক প্রকাশ, আগতদের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদিতে বহু সময় কাটাইতেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বেলুড় মঠে আসিয়া তিনি মঠের ঠাকুরপূজা ও অন্যান্য কার্য্যে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত ভাবের আদান-প্রদানও তাঁহার অন্যতম কার্য্য ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নবযুগের মানবের জীবনকে ভগবদ্ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া ভাগবতজীবন লাভের এই নূতন পথে নূতন উদ্যমে কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত ঠাকুরের কথামৃতে

সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত রহিয়াছে। এই বার্ত্তাই স্বামীজী দেশ-বিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বাণীকেই তাঁহার পরবর্ত্তীরা স্বীয় জীবন ও আলাপ-আলোচনায় রূপ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ অন্যতম। অতএব এই দৃষ্টিকোণ হইতে দুই-চারিটি ঘটনা ও কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন হইতে তিনি যখন ফিরেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডাক্তার বাড় বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ বিষয়ে কত লোকে কত কথা বলে, কত সন্দেহ পোষণ করে। ঠাকুর ছেলেমানুষের মত তারককে সোজা প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (সাধু)—তবে রোগ হয় কেন?" বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সাধু-জীবনের সহিত পরিচিত সন্ন্যাসী তারকনাথ উত্তর দিলেন, "ভগবানদাস বাবাজী অনেকদিন রোগে শয্যাগত ছিলেন।" ভাগবতজীবনের সহিত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন আবশ্যিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই—এই সোজা কথাটিকে সরল দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি এক কথায় বুঝাইয়া দিলেন। এখানে যুক্তির মারপ্যাঁচ বা ভুয়া আধ্যাত্মিকতার কোন কুহেলিকার আবরণ নাই। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বেলুড়ে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তাঁহার আহারের পর চাকররা উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিতে সম্মত না হইলে ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব স্বামী শিবানন্দ অম্লানবদনে উহা পরিষ্কার করেন। এক দক্ষিণদেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোক তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এত জায়গায় ঘুরে এসেছি, কিন্তু সব জায়গায়ই খৃষ্টান বলে আমায় অবজ্ঞা ও দূর-ছাই করেছে। এমন ভালবাসা, এত যত্ন আর কোথাও পাইনি।" ঠাকুর বলিতেন, ভক্তের জাত

নাই। ঠাকুরের ভক্তের জীবনে সেই বাণীরই পরিপূর্ত্তি। ২৩।২।১৮৯৪ তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। ইহারা যদ্যপি হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে···তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের পত্নী লেডী মিণ্টো বেলুড় মঠ দর্শন করিয়া যখন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, এই মঠ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত, তখন সর্ব্ববিষয়ে স্বামীজীর পদানুগ হইলেও মূল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "এই সঙ্ঘ আমরা সৃষ্টি করিনি ; ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।" আর ঠাকুরের আগমনের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি বলিলেন, "এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনী এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে।···তাইতো সমগ্র জগতে এক মহা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।" পরে আমরা দেখিব, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ যখন ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত হানিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তখনও সঙ্ঘের কর্ণধার মহাপুরুষজী হাল ধরিয়া অবিকম্পিত হস্তে, অভ্রান্ত দৃষ্টিতে সঙ্ঘতরীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকেই চালাইয়া যাইতেছেন।

কয়েক বৎসর বেলুড় মঠে এবং গুরুভ্রাতাদের সহিত তীর্থদর্শনাদিতে কাটাইয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলমোড়ায় উপস্থিত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীও মহাপুরুষজীর অনুরোধে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তথায় উপস্থিত হন। ইঁহাদের উপস্থিতিকে

অবলম্বন করিয়া সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষজী আলমোড়ায় যাইতে উদ্যত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনাকে তপস্যায় কিছুতেই যেতে দেব না।" কিন্তু তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া পরে বলিয়া দেন, তিনি যেন সেখানে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। স্বামীজীর সেই অটুট সঙ্কল্প ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রূপায়িত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষজী কার্য্যোপলক্ষে আলমোড়া ত্যাগ করেন; বিভিন্ন কারণে আর তিনি সেখানে ফিরিতে পারেন নাই। বাকী জীবন তিনি প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। এইবারে মঠে যাইবার পথে তিনি জামতাড়ায় একটি মঠস্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করেন।

মহাপুরুষজীকে সাধারণতঃ সকলে গুরুগম্ভীর বলিয়াই জানিত। স্বাধীন সন্ন্যাস-জীবন পরিচালনে অভ্যস্ত মহাপুরুষজী স্বভাবতঃই লোক-দেখান অমায়িকতা বা লোকব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না। ইহাতে অনেক ভুল ধারণার উৎপত্তি হইত; এমনকি অনেকে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত। কিন্তু এইবারে মঠবাস-কালে তিনি বুঝিতে পারেন, মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের বাহক হিসাবে যেমন একটা ভাষার প্রয়োজন, তেমনি সকলে বুঝিতে পারে এমন একটা চিরাচরিত লোকব্যবহারও আবশ্যক। ইহা উপলব্ধি করার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা কোমলতার ছাপ পড়ে যে উহা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সদাপ্রসন্ন বদন, সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, অল্পে সন্তুষ্টি, তীব্র বৈরাগ্য, সর্ব্বদা ভগবৎপ্রবণতা ইত্যাদি মহাপুরুষোচিত গুণাবলী সম্মিলিত

হইয়া তাঁহার "শিবানন্দ" নাম সার্থক করিয়াছিল। লোকে সহজেই বুঝিতে পারিত, ৺তারকনাথের প্রসাদে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে মহাদেবের গুণাবলী প্রকটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এইবারে বেলুড়ে থাকা-কালে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর-রূপে মঠের কার্য্যপরিচালনে রত হইতে হয়। বিশেষতঃ পূজনীয় প্রেমানন্দজী তখন প্রায়ই প্রচারকার্য্যে বাহিরে থাকিতেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে লীন হইলে মহাপুরুষজীকেই তাঁহার সমস্ত কর্ম্মভার লইতে হইল। মহাপুরুষজী একদিকে যেমন স্বামীজীর পদানুগ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের মানসপুত্র পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তাই উভয়ের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতা ছিল। মহারাজ দূরে কোথাও যাইতে হইলে অনেক সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং মঠের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার দায়িত্ব মহাপুরুষের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। মহাপুরুষ মহারাজের এই সময়কার ভাবধারা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত জনৈক সাধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয়ে সদা সর্ব্বদা প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি জাগরূক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁর দীন দরিদ্র মূর্ত্তিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে সমর্থ হও।" ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল নেহেরু ও মহম্মদ আলি প্রভৃতি কংগ্রেস-সেবীরা মঠে আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত দেখাইয়া দেন। পরে তাঁহারা চলিয়া গেলে বলেন, "স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীর চরিত্র সকলের অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা

হবে।” ঐ সময়ে জনকয়েক দেশপ্রেমিক ও দেশসেবকের সহিত অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়, তাহাতে তিনি পরিষ্কার বুঝাইয়া দেন যে, রাজনীতির সহিত তাঁহার বিরোধ না থাকিলেও কোন সম্পর্ক নাই। অসহযোগ আন্দোলনের গুণাগুণ বিচার না করিয়া তিনি বলেন যে, স্বামীজী দেশের উন্নতির জন্য যে ধর্ম্মভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, উহাকেই তিনি সর্ব্বোত্তম মনে করেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন উহারই অনুসরণ করিতেছে। ঐ সময়ে দীক্ষালাভের জন্য কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, “আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস।··প্রভুই এযুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট।” এই গুরুগিরির বুদ্ধি পরবর্ত্তী কালেও তাঁহার ছিল না। মঠ-মিশনের অধ্যক্ষপদে থাকিয়া যখন অপরকে অধ্যাত্মপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন তখনও তিনি বলিতেন; “দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এবুদ্ধি আমার নেই।···তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন; তিনিই আমার ভিতরে বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র।”

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় প্রচারকার্য্যে রত আছেন, এমন সময় শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অসুখের খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজা মহারাজ শীঘ্রই স্বস্বরূপে লীন হইলেন। অতঃপর মহাপুরুষজীই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন। নিরভিমান আপন-ভোলা স্বামী শিবানন্দ ইহা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পায়। তিনি বলিতেন, “আমি তো তাঁর

(স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) চাকর। তাঁর পাদুকা মাথায় করে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন, আমিও তেমনি মহারাজের পাদুকা মাথায় করে তাঁর রাজ্য চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমনি করছি।" মহাপুরুষজী কুকুর ভালবাসিতেন। নিজের কুকুর 'কেলো'র দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এবং এক হাত নিজের বুকে রাখিয়া বলিতেন, "এ হল আমার কুকুর।" আবার এক হাত ঊর্দ্ধে ঠাকুরের ছবির দিকে উঠাইয়া অপর হাতে নিজেকে দেখাইয়া বলিতেন, "আর এ হল তাঁর কুকুর।" আর বলিতেন, "আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই—তুমি বসিয়েছ, তাই বসেছি।" তখন তিনি ঠাকুরের নির্দ্দেশে নির্ব্বিচারে জগৎ-কল্যাণে রত। তাই বলিতেন, "আমি এখন মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।" বস্তুতঃ বৃদ্ধ বয়সের দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ হাঁপানির টানে কষ্ট পাইতেন বলিয়া সেবকগণ ভক্ত ও সাধুদের যাতায়াত অনেকটা নিয়মিত করিতে বাধ্য হইলেও তিনি নিজে সর্ব্বদা সকলের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও ভক্তদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেই উন্মুখ থাকিতেন। সুস্থাবস্থায় তাঁহার দ্বার সকলের জন্য সর্ব্বদা অবারিতই থাকিত বলা চলে। আর কত আত্মীয়তার সহিত তিনি সকলকে গ্রহণ করিতেন! ভক্তদের পরিবারের সকলের, এমন কি ক্ষুদ্র শিশুদেরও খবর লইতে ভুলিতেন না, যেন তিনিও ঐ পরিবারেরই একজন। আবার অনেককে আদর করিয়া নিজের দেওয়া নামে ডাকিতেন; আলাপ-আলোচনায় কত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত, সহানুভূতি প্রকাশ পাইত, সাহস উদ্দীপিত হইত। গরীব ভক্তের দান তো তিনি গ্রহণ করিতেনই না, বরং

কেহ কেহ তাঁহারই নিকট অর্থসাহায্য পাইত, অথবা তিনি বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ ভক্ত তাঁহার নিকট পাইত গুরুর আশীর্ব্বাদ, পিতা-মাতার স্নেহ, এবং বন্ধুর অকৃত্রিম সাহায্য। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মহাপুরুষ ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শ্রীরামকৃষ্ণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য আপনার সুখ-সুবিধা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র ব্রত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাপ্রচার।

মঠ-মিশনের অধ্যক্ষরূপে তাঁহাকে প্রায়ই অন্যত্র যাইতে হইত। এইরূপে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারত, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে ও নাগপুর, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর ও জামতাড়ায় গমন করেন এবং ঐ সব জায়গায় নূতন আশ্রমস্থাপন, নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন বা ভাবী গৃহের ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদি করেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু ভক্ত নরনারীকে শ্রীরামকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মঠ-মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহাসমাধি লাভ করিলে মহাপুরুষজী হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় প্রথমে মধুপুর ও পরে কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীতে একদিন তাঁহার অনুভূতি হইল—তাঁহার মন অসীমে বিলীন হইতে চলিয়াছে, এমন সময় জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিতদেহ মহাদেব সেখানে উপস্থিত হইলেন। অচিরে শিবমূর্ত্তিস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোর এখনও থাকতে হবে; আরও কিছু কাজ আছে।" ইহার পূর্ব্বে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উতকামণ্ডে অবস্থানকালে তিনি একদিন নীল পর্ব্বতের

সৌন্দর্য্য অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় অনুভূতি হইয়াছিল, তাঁহার শরীর হইতে কে যেন বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ এই জাতীয় অনুভূতি তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। স্থানাভাবে সব কয়টির উল্লেখ করা অসম্ভব।

অতঃপর তাঁহার মঠ-মিশন পরিচালনা-বিষয়ে অপূর্ব্ব নিজস্ব রীতির আর একটু পরিচয় দিলে মন্দ হইবে না। তিনি বলিতেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়।'" শাসন সম্বন্ধে বলিতেন, "সকলেই নির্দ্দোষ হতে এসেছে। নির্দ্দোষ হয়ে কেউ আসেনি। খালি ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা মানুষের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" এক সময়ে ব্যয়-সঙ্কোচের কথায় বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমাদের তো কিছুই অপব্যয় হচ্ছে না। কি আর খরচ কমাবে?...তাঁকে জানাও। ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।" এক সময়ে জনকয়েক ব্যক্তিকে সঙ্ঘের অশেষ অকল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যের জয় নিশ্চয়; সত্যাশ্রয়ী প্রভুর গড়া সঙ্ঘের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তোমরা নিশ্চিত জেনো।" আর একদিন ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এই যুগপ্রবর্ত্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে। কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ, বাবা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামীজীর কথা।" আবার ঐ সকল দুষ্কৃতকারীরা ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি বলিলেন, "প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এদের রক্ষা করো, এরা তোমারই আশ্রিত। এদের মনের গতি ঘুরিয়ে দাও, সুবুদ্ধি দাও। আর যাই কর, ঠাকুর, এদের ত্যাগ করো না।" শত্রুরও প্রতি ইহাই মহাপুরুষের মহাপুরুষোচিত আশীর্ব্বাণী। দক্ষিণ

ভারতে ভ্রমণকালে তিনি সদলবলে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে) এক ভক্তগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যান। ভোজনান্তে বিশ্রামকালে বাহিরে এক কলরব সমুত্থিত হওয়ায় তিনি চাহিয়া দেখিলেন একদল লোক শেয়াল-কুকুরের মত পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি হইতে খাবার কুড়াইয়া খাইতেছে। ইহাতে ব্যথিতচিত্তে তিনি গৃহস্বামীকে আদেশ করেন তাহাদিগকে ভরপেট খাওয়াইতে এবং দুঃখের সহিত বলেন, "এ পুঞ্জীকৃত পাপের যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না হবে, ভারতের ততদিন কোন আশা নেই।" একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবের দিনে চারিদিকে ঘনঘটা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন, বুঝিবা সমস্ত পণ্ড হয়। মহাপুরুষজীকে উহা বলিলে তিনি ঠাকুরঘরে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে চলিলেন এবং পরে বাহিরে আসিয়া সকলকে ভাগবতের গোপীগীতার একটি শ্লোক শুনাইয়া বলিলেন—ভগবানই সমস্ত বিপদ হইতে ভক্তকে রক্ষা করেন; তাঁহারই শরণ লওয়া আবশ্যক। আর বলিলেন, "উৎসবের আয়োজন যেমনটি হচ্ছে তেমনিই করে যাও। তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আর কোন দুর্য্যোগ হয় নাই। জনৈক সাধু কাজ ও জপধ্যানের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করিলে তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ধ্যান-জপের প্রাধান্য অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছ? ধ্যানজপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ কখনও হতে পারে না। কর্ম্ম ও উপাসনা একসঙ্গে চালাতে হবে।" ভক্তদের দান তিনি সহজে গ্রহণ করিতেন না। একজন গরীব ভক্ত তাঁহাকে কিছু প্রণামী দিলে ভক্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উহা গ্রহণ করিয়া আবার তাহাকেই দিয়া

সংসারের কাজে ব্যয় করিতে উপদেশ দিলেন। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে অজস্র দেখিতে পাওয়া যায়। লালগড়ের জমিদার তাঁহাকে একবার একখানি মূল্যবান ক্যামেল হেয়ারের কম্বল দেন। ভক্তের মানরক্ষার জন্য উহা গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু দুই-চারি দিন পরেই বলিলেন, "দে দে উহা মায়াবতীতে পাঠিয়ে।" অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান জিনিস দান করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বলিতেন, "তোমরা কি আমাকে বিলাসী বাবু সাজাতে চাও?" এবং ঐ জাতীয় জিনিস প্রত্যাখ্যান করিতেন অথবা অপরকে বিলাইয়া দিতেন। প্রণামীর টাকা বা গুরুদক্ষিণার বস্ত্রাদিও তিনি দুই হাতে বিলাইতেন। তাঁহার আশ্রিতদের মধ্যে একজন ছিল এক গরীব জেলে। তাহাকে সাহায্য করার জন্য কায়েমী হুকুম দিয়াছিলেন, উহার মাছ দর-দস্তুর না করিয়া কিনিতে হইবে।

এইভাবে সঙ্ঘ-পরিচালনায় রত থাকাকালে ১৯৩৩ ইংরেজীর ২৫শে এপ্রিল দারুণ পক্ষাঘাতে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়া এবং বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। এই অবস্থাতেও তিনি ভক্তদিগকে কৃপা করিতেন, ভক্তগণ তাঁহার বাম হস্তের স্পর্শ ও কৃপাকটাক্ষলাভে ধন্য হইতেন। সুস্থাবস্থায় তিনি প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মঠের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নিত্য ঠাকুরঘরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে উৎসর্গীকৃত-জীবন এই মহাপুরুষ শেষ-শয্যায় শায়িত হইলেও তাঁহাকে তখনও ঠাকুরের সেবাদি বিষয়ে প্রত্যেক খুঁটিনাটি কথা জানাইতে হইত। কাশীতে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার জিব কেটে নিলেও আমি তাঁরই কথা ভাবব, আর তাঁরই নাম করব।" সে কথা অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার

জীবনে পরীক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার সন্তানকে এইভাবে আরও প্রায় এক বৎসর শয্যাশায়ী রাখিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

[এক]

বেলুড় মঠ, ২১শে মার্চ্চ, ১৯২৪। বেলা প্রায় তিনটার সময় মঠে যাইয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ (শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ) মহারাজজীর শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিতেই অতি স্নেহভরে মহারাজজী আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক পুরাতন ভক্তের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "মৃত্যুই মানুষের পরিণাম। কেউ আগে, কেউ পরে। Let it be granted (তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক)। কিন্তু এর মধ্যেও ভগবানকে মনে রাখতে হবে, তাঁকে ভুলে থাকলে চলবে না।" উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে একটি মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ পড়াশুনা কর্, বিয়ে করিস্ নি, কর্‌লেই দুঃখ পাবি। এ ভাবে আদর্শটি ঠিক রেখে জীবন কাটিয়ে দিবি, বেশ আনন্দে থাকবি। ভয় কি? শ্রীশ্রীঠাকুরই তোকে দেখবেন।" একটি ছেলে সংসারত্যাগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাকে বলিলেন, "কেন সংসারত্যাগ করবে? এই বেশ আছ। তবে বিয়ে করো না। চাকরি কর, নিজেরও ভরণ-পোষণ কর, পরেরও উপকার কর—এই তো মহৎ কাজ।"

এইবার মহাপুরুষজী মঠবাড়ীর একতলায় পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বেঞ্চে আসিয়া বসিলেন। গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে; একখানা নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছিল। মহারাজ আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখ, কেমন পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে আর মাঝি হাল ধরে তামাক খাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই উপমা আমাদের দিতেন। বলতেন, 'প্রথমে খাটতে হয়, সাধন-ভজন করতে হয়,

তারপরে এই রকমটি হাল ধরে থাকলেই হলো। নৌকা পারে যাবেই।' তোমরা এখন বেশ সাধন-ভজন করে নাও, পরে সুযোগ নাও আসতে পারে। সাধন-ভজনের মত জিনিস নেই। তপস্যার দ্বারা কি যে না হয় বলা যায় না। সরলভাবে, আগ্রহের সহিত compulsory (বাধ্যতামূলক) ভাবে তাঁকে ডাকতে হবে ; তবে তো শান্তি পাবে। সব কাজের সময় পাও, কেবল ভগবানকে ডাকবার বেলা'ই সময় নেই বলে lame excuse (বাজে ওজর) কর। আমি একথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। সারা দিনেও পনের-বিশ মিনিট সময় পাও না? ব্যাকুলভাবে তাঁকে দশ মিনিট ডাকলেও হবে।"

এমন সময় জনৈক ভক্ত একটি জপমালা শোধন করিয়া দিবার জন্য মহাপুরুষজীর হাতে দিলেন। "মালা কার?"—মহাপুরুষজী প্রশ্ন করিলেন। ভক্তটি সঠিক উত্তর দিতে না পারায় মহারাজজী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি বলছ 'বোধ হয়—অ্যাঁ অমুকের'। তার নাম জান না? এরকম কথায় চলে না। আমি তার নাম জানি না, কি করে তার মালা শোধন করব? যার মালা তাকেই আসতে হবে। এসব কাজ বরাতে হয় না। তোমরা তা বোঝ না। এসব কাজের পিছনে যে seriousness (গুরুত্ব) আছে তা তোমাদের জানা নেই, মনে কর ছেলেখেলা। মালা ঠিক ঠিক নিষ্ঠা করে জপ করতে হয়। মালা উপবাসী রাখতে নেই, অর্থাৎ রোজই জপ করতে হয়।"

ভবানীপুরের ম-বাবু আসিয়া প্রণাম করিলে সস্নেহে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে কালীঘাটের আ-বাবুর সম্বন্ধে কথা উঠিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আ-বাবু সন্ন্যাসী কিনা।

বলিলাম, "তিনি তো সন্ন্যাসীর মতই থাকেন, তিনি বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। শুনেছি তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর তিনি সব ছেড়ে দিয়ে সাধুভাবে জীবনযাপন করছেন।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত এক ভদ্রলোক একটু কটাক্ষ করায় মহাপুরুষ মহারাজজী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তা যা হ'ক, একটি অবস্থা এসেছিল। একটা খুব shock (আঘাত) পেয়ে সব ছেড়ে দিয়েছেন। এ-ও কি কম কথা ? কত লোকই তো এরকম shock (আঘাত) পাচ্ছে। কিন্তু কৈ ছাড়ছে কে ? দুদিন পরেই আবার যা তাই। এইটিই আ-বাবুর সুকৃতি ছিল। অমঙ্গলের মধ্য দিয়েই তো মঙ্গল আসে। মানুষ প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারে না, তাই অধীর হয়ে পড়ে। দুঃখই তো তাঁকে পাবার উপায়। সুখে মানুষ ভগবানকে ভুলে থাকে। মনে করে, এমনিই চিরদিন চলবে, কিন্তু বোঝেনা যে দুঃখ নিকটেই আছে। স্বামীজী বলতেন, 'সুখ আসে দুঃখের মুকুট পরে'।" অতঃপর আমরা সকলে মহারাজজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* * *

১লা এপ্রিল, ১৯২৫। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজী ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্রমস্থ সাধু ভক্তগণ খুবই আনন্দিত। আমরা প্রাতে যাইয়া পূজনীয় মহারাজজীকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি সকলেরই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকলকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। কতক্ষণ পরে বি বাবু আসিলেন। তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলিলেন, "আমরা হচ্ছি Indian (ভারতবাসী)। আমাদের আদর্শ হচ্ছে plain living and high thinking (সরল জীবন ও

উচ্চ চিন্তা)। মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলেই হলো। আমরা মোটরগাড়ীতে না-ই বা চড়লুম, তাতে আর কি এসে যাচ্ছে। দেখছ তো সব লোক সংসারে সুখে থাকবার জন্য কত কষ্ট করে সব যোগাড় করে, আর ছু'দিন যেতে না যেতেই মরে গেল, এত মান যশ সবই গেল। Newspaperএ (সংবাদপত্রে) মৃত্যুর পর হয়ত একটু লিখলো, ব্যস্ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে লাভ করা, তা না হলে সবই বৃথা। কিন্তু এমনি মহামায়ার মায়া যে কিছুতেই বুঝতে দেন না। এই যে লোক মরছে, তাতে কি লোকের চৈতন্য হচ্ছে যে আমরাও একদিন মরবো? এরও কিন্তু একটা কারণ আছে। স্বামীজী বলতেন, 'মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা কি বুঝি? মৃত্যু বাস্তবিক কি? আমাদের মধ্যে অজর অমর আত্মা রয়েছেন, তাঁর তো আর মৃত্যু নেই। তাই মৃত্যু দেখে আমাদের মনে strike (আঘাত) করে না। মৃত্যু তো আমাদের এই bodyটার (শরীরের)।' স্বামীজী এই সব কথা আমেরিকাতে বলেছিলেন।"

এমন সময় আমাদের এক বন্ধু আসিয়া মহারাজজীকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি করিয়া রিপু দমন করা যায়। মহারাজজী খুব স্নেহভরে বলিলেন, "তোমার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই দমন করতে পার। যদি ঠিক বুঝে থাক যে রিপু তোমার অনিষ্ট করছে, তবে কেন তাকে indulgence (প্রশ্রয়) দেবে? তাকে বশে রাখতে হবে। খুব দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও চাই, আবার ভগবানের কৃপাও চাই। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকলে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে, তাঁর কৃপায় অনায়াসে এই শত্রুকে দমন করা যায়।"

উপস্থিত আর একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, যদি কেউ সংসারত্যাগ করতে চায় অথচ তার বাবা-মা নিষেধ করেন, তখন তার কি করা কর্ত্তব্য ?"

মহারাজজী—"তা বেশ তো, ত্যাগ করবে না। যদি তোমার ভগবানলাভ করবার জন্য ঠিক ঠিক বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা আসে, তবেই সংসারত্যাগ করার দরুন কোন পাপও হবে না। আর তা যদি না হয়, কেবল পেটের দায়ে ও আলস্যবশতঃ সংসারত্যাগ করে আস, তবে নিশ্চয়ই পাপ। কারণ যে বাপ-মা তোমাকে এতদিন প্রতিপালন করলেন, তাঁরা তোমার নিকট কিছু আশা করেনই। তা তুমি তাঁদের না দিলে চলবে কেন, যথার্থ বৈরাগ্যবান ছেলে সংসারে বড়ই বিরল। বাবা, সংসারত্যাগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। যাতে ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস আসে তার জন্য ব্যাকুল হও। তিনিই সময় হলে টেনে নেবেন। তখন দেখবে সংসারে থাকাই কঠিন হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'ঘায়ের মামড়ি নিজে টেনে তুললে রক্ত বেরুবে। ঘা শুকুলে মামড়ি আপনিই পড়ে যাবে।' একখানা লাল গেরুয়া কাপড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসই হল আসল কথা। তা যদি না থাকে তবে নূতন বৈরাগ্যের প্রেরণায় দিন কতক চলবে, এই পর্য্যন্ত। তাঁর নাম তাঁর কর্ম্ম, এসব করে যাও, সময়ে দেখবে সব তিনি ঠিক করে অপার আনন্দের অধিকারী করবেন। আমরা খুব আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান তোমাদের বিবেক বৈরাগ্য দিন এবং জীবনে খুব শান্তি পাও। আর কি বলব, বাবা ?"

ইতিমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজজীর জনৈক বাল্যবন্ধু শ্রীজগদীশ সেন উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্রমাগত তাঁহার সাংসারিক অশান্তির

কথা কহিতেছেন এবং কাঁদিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজজী নিবিষ্ট মনে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। এইবার ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন, অফিসে যাইতে হইবে। মহারাজজী সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাত্রিতে আবার একে একে সকলে গদাধর আশ্রমে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর দর্শন-আশায় সমবেত হইলেন। আমরা প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। মহাপুরুষজী বলিলেন, "জগতের শান্তি হবেই। সকলেরই যখন এক বুদ্ধি, অনেকটা একভাব হবে ও স্বার্থপরতা কমে যাবে, তখনই শান্তি হবে। যত দুঃখ এই স্বার্থপরতা থেকেই হচ্ছে। লিগ্ অব্ নেশন্স্ (জাতি-সঙ্ঘ) ইত্যাদি যা বল সবই ভুয়া। আমাদের সকলেরই mentality (মানসিক অবস্থা) যখন changed (পরিবর্ত্তিত) হবে এবং যখন বুঝব সকলেই Common Father-এর (পরমপিতার) সন্তান, তখনই আমাদের দ্বেষবুদ্ধি যাবে ও প্রকৃত শান্তি আসবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনে সকলেরই মানসিক ভাব বেশ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে এবং সত্যযুগের লক্ষণ সব দেখা যাচ্ছে। রজোগুণের মধ্য দিয়ে সত্ত্বগুণ প্রকাশ হচ্ছে। তা ভিন্ন উপায় নেই। প্রকৃতি—আদ্যাশক্তি আলোড়িতা হয়েছেন, আমরা বেশ বুঝতে পারছি। তাই তো এখন সকল দেশেই প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে। এই যে শ্রীশ্রীঠাকুর সুদীর্ঘ বার বৎসর কঠোর সাধনা করে গেলেন, এর একটা ফল ফলবেই। কারণ তাঁর সাধনা জগতের হিতের জন্য। তাঁর নিজের জন্য তো করবার কিছুমাত্র দরকার ছিল না। এখনও সব মহাপুরুষ আছেন যাঁরা সর্ব্বদাই এই জগতের হিতের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম ও সাধনা করছেন।"

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মুখে এই সব আশার কথা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ। ঘরে এক অপূর্ব্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। বি-বাবু আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "কি হে বি-, আমাদের যে একেবারেই ভুলে গেলে! মঠে যাও না কেন? মঠে যাবে। কয়েক বৎসর ব্যারিষ্টারি কর, পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে লাগ।" বি-বাবুর বন্ধু বলিলেন, "বি- বিয়ে করে ফেলেছে। কি আর করবে?" মহারাজজী ব'ললেন, "তা হলেই বা। বেশ দু'টি শক্তির combination (সংযোগ)। আরও ভাল কাজ করতে পারবে। স্ত্রীকেও এই সৎকাজে টেনে নেবে। বাস্তবিক, মেয়েদের টেনে নিলে তারাও বেশ কাজ করতে পারে। মেয়েদের কি দোষ? পুরুষ যেমন চায়, মেয়েরা সেইরূপই শেখে। তাদের সৎশিক্ষা দিলে, তারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির উন্নতি করতে পারে। এদের ভেতর ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস বেশ ভালই আছে। তোমরা তো মেয়েদের জন্য কিছুই কর না। তারা কি তোমাদের সংসারে কেবল ভাত-ই রাঁধবে? তারাও ঠিক ঠিক কাজ করে ধন্য হবে।"

এইবার আশ্রমের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। নানা কথার পর পূজনীয় ললিত মহারাজ (কমলেশ্বরানন্দ) বলিলেন, "এই সব ছেলেরা আমাকে খুব সাহায্য করে।" মহাপুরুষজী "তা বেশ, এতো ভাল কাজ। ঠাকুরের কাজে সাহায্য করে, এতো উত্তম। দেখ সংসারে সকলেই নিজের জন্য কাজ করে ও সংসার প্রতিপালন করে; কিন্তু সে-ই 'মানুষ' যে পরের জন্য কাজ করে। মানুষের কর্ত্তব্যই পরের সাহায্য করা। তা না হলে দেখ, পশুপক্ষীও খাচ্ছে এবং তাদের শাবকদেরও খাওয়াচ্ছে। কিন্তু মানুষও যদি

কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে তবে আর পশুপক্ষী হতে তার তফাৎ কি? মানুষের কাজ মানুষকে সাহায্য করা। এইজন্যই তো স্বামীজীর সেবাধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' "

কথাপ্রসঙ্গে একজন ভক্ত "দুঃখ কি?"—এই সম্বন্ধে মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন। মহারাজজী উত্তরে বলিলেন, "শান্তি পাবার জন্য সকলেই আকুল; কিন্তু সেই শান্তি যে কোথায় কোন জিনিসে আছে তা মানুষ খুঁজে পায় না, তাই যা তা ক'রে কষ্ট পায়। এই যে লোক সন্ন্যাসী হয়, তার অর্থ—সেও শান্তি খোঁজে। সে যে জিনিসে শান্তি খুঁজেছিল তাতে তো মিলল না, তাই বের হয়ে পড়ল, ভগবানকে ধরল এবং তাতে প্রকৃতই শান্তির সন্ধান পেল।"

রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে আস্তে আস্তে প্রণাম করিয়া পূজনীয় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিমল শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

* * *

৯ই মে, ১৯২৫, শনিবার। স্থান বেলুড় মঠ। বৈকাল ৪॥০টার সময়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে আগত একজন সন্ন্যাসী ওখানকার সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নেই, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর কর, সত্য প্রকাশ হবেই। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, শ্রীশ্রীমাও আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। এ স্থানটি শ্রীশ্রীঠাকুরের। কালে ওটি মহাতীর্থ হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি

মনে করছ ওটি সৌখীন লোকের বাগানবাড়ী হবে? এস্থান কলকাতার পাশে; কত লোক ওখানে গিয়ে শান্তি পাবে। এটি অমনভাবে থাকবে না। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা ছিল তিনিই জানেন। দেখনা এখন আবার সব ঠিক হচ্ছে।"

জি-বাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ মহারাজজী বলিলেন, "দেখো জি-,এর দ্বারা এখন কেবল ভিত্তি তৈরী হচ্ছে, পরে কিন্তু স্বামীজীর আদর্শ দেশকে নিতেই হবে। দেখছনা— এখন সকলেই তাঁর আদর্শ নিতে চায়। তা ভিন্ন উপায় কি? মহাত্মা যা বলছেন অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে, তা স্বামীজী বহুদিন পূর্ব্বেই বলেছেন।"

অধ্যাপক ভ-বাবু বলিলেন, "আশুবাবু মারা গেলেন, তা না হলে আমাদের কলেজের আরও শীঘ্রই উন্নতি হত। আশুবাবুর মত এমন ব্যক্তিত্ব বড় দেখা যায় না। আমাদের দেশের সব বড় বড় লোক ক্রমশঃ মারা যাচ্ছেন, চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলেন। যেরূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় এই দেশ ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে।" এইসব কথা শুনিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী খুব জোরের সহিত বলিলেন, "তা নয়, ভ-। আবার শক্তিমান লোক সব জন্মাবে। মার ইচ্ছা নয় যে, এই দেশ এভাবে উৎসন্ন যায়। তিনি কাউকে কাউকে রাজনীতিতে বড় করে তোলেন। কাউকে বা বিজ্ঞানে। কিন্তু শক্তি তো মার নিকট হতেই সব আসছে। তবে এতদিন একটা শক্তিতে কাজ হচ্ছিল এক- জনের ভেতর দিয়ে, এখন তা না হয়ে সকলের ভেতর দিয়ে সেইভাবে কাজ হবে। এখন সকল দেশেই সাড়া পড়ে গেছে,

এখন ভারতের মঙ্গল হবেই। চৈতন্য-শক্তির বিকাশ হচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে।"

দ-বাবু প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, সংসারে থেকে কেউ সৎভাবে ভগবানলাভ করতে চায়, কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দেয়। সে কি তখন তাদের ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে সাধন-ভজন করবে?"

মহাপুরুষজী—"কখনও না, বরং যারা বাধা দেয় তাদের নিয়েই ধর্ম্ম করবে। যাতে তাদেরও ভগবানে মতিগতি হয় তার চেষ্টা করবে। কারণ তুমি যদি বাইরে গিয়ে ধর্ম্মলাভ কর তবে তো তোমার নিজেরই হলো। অন্যের তাতে কি লাভ? সেজন্যই বল্‌ছি সকলে মিলে একটা সময় নির্দ্দেশ করে সকালে হোক, বৈকালে হোক, ভগবানের নাম করবে। সংসার অনিত্য, রোজই এই সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করে ভগবানে মনপ্রাণ দেবার চেষ্টা করবে। মনে মনে ভাববে—'এখন তো বেশ চলছে; কিন্তু এমন তো চিরদিন চলবে না।' তবেই মনে বিবেক বৈরাগ্য আসবে, ভগবানকে মনে পড়বে। কোথাও দেখতে পাইনে যে কোন পরিবার একটি সময় নির্দ্দেশ করে ভগবানের নাম করে। কেবল বাজে বক্‌ছে।"

দ-বাবু—"তাঁকে ডাকতে হলে সময়ের দরকার। নানা বিঘ্ন আছে। এমন অবস্থায় তাঁকে কি করে ডাকবো?"

মহাপুরুষজী—"তুমি কি বল্‌ছ? সময় নেই, বাধা বিঘ্ন! যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে নিশ্চয়ই হবে। তোমাদের খাওয়া শোওয়া প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, আর কিনা ভগবানকে ডাকতে পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছ না! এ কি কথা বলছ? বিঘ্ন যা বলছ তা তো আছেই এবং থাকবেও। তা কখনও যায় না।

এসব বাধা-বিঘ্নের মধ্যেই সংগ্রাম করতে হবে। তাতেই জীবন তৈরী হয়ে যাবে। যেখানে বাধা নেই সেখানে জীবন নেই।"

দ-বাবু—"মহারাজ, বাড়ীতে এমন অবস্থা যে একজন যদি জপধ্যান করে, তবে সে যাতে তা না করতে পারে, সেভাবে অন্যান্য লোক তাকে কষ্ট দেয়। এমন অবস্থায় অন্যত্র যাওয়া সঙ্গত কি ?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে সাধন-ভজন করবে। তখন বাড়ীতে কোন খবর দেবে না।' "

দ-বাবু—"হাঁ, তা বটে, কিন্তু তারা খবর পেলে আবার যন্ত্রণা দেয়। এমন অবস্থায় কি করে ভগবানের দিকে এগুনো যায় ?"

মহাপুরুষজী—"তোমারই মাথার মধ্যে এসব ভাব রয়েছে। যদি বাস্তবিকই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই পথ করে দেবেন। 'God helps those who help themselves'. (ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেরা প্রযত্ন করে)। আমরা এটা বেশ জানি। আমাদের কথায় বিশ্বাস কর।"

দ-বাবু—"এই মঠে আমাদের থাকবার উপায় হয় কি ?"

মহাপুরুষজী—"না, কারণ স্থানের বড় অভাব।"

দ-বাবু—"যদি একটা কলেজ হয় তবে বেশ হয়।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হয়। আমাদের কাজ মন্থর অথচ নিশ্চিত। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের কোন লোক পর্য্যন্ত যেখানে যায়নি সেখানেও প্রচারকেন্দ্র হয়ে গেছে।"

দ-বাবু—(নিজের একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়ে) "একে আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাজজী।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে এখন। এরা শিশু। এরা ধর্ম্মের কি বুঝে? এখন এরা বাবা-মাকে জানে। তাঁরাই এদের গুরু। বাবা-মা যদি ভাল হন, তবে ছেলেরাও ক্রমে ভাল হবে। বাবা-মাকে যদি ছোটবেলা থেকেই সাধন-ভজন করতে দেখে, তাঁদের ছেলেরাও তাই শেখে।"

প্রসঙ্গক্রমে মাছ খাওয়া লইয়া কথা উঠিল। মহারাজজী বলিলেন,—"এদেশের লোক যে মাছ খায় তা তারা একবার মনেও করে না যে, এর দরুন একটা জীবের প্রাণনাশ হয়। পশ্চিমদেশে এটা হবার জো নেই। মাছ খেলে আর রক্ষা নেই। অবশ্য যদি কারও ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাঁর পক্ষে সবই সমান, কারণ তখন তিনি শাক-সব্জীর মধ্যেও প্রাণ দেখতে পান।"

'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে জনৈক ব্রহ্মচারী আসিয়া শ্রীশ্রীমহা-পুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাপুরুষজী—"আমার শরীর ভাল নেই।"

ব্রহ্মচারী—"চলুন, মহারাজ, 'উদ্বোধনে' কয়েকদিন থেকে শরীরটা সেরে আসবেন।"

মহাপুরুষজী—"তুমি বলছ সত্য, আমার কিন্তু কলকাতায় থাকতে ইচ্ছা হয় না। আমি ওখানে গেলেই অন্যরকম হয়ে যাই। ঐ সব elements (বস্তু) আমার ভালই লাগে না। এই মঠে আছি—বেশ আছি। দেখ যেদিকে তাকানো যায় সুন্দর মনে হয়! পূর্ব্বে গঙ্গা, উপরে আকাশ, পশ্চিমে শ্রীশ্রীঠাকুরঘর, দক্ষিণে ফুলের বাগান।

কেমন সুন্দর একটা ভাব! তুমি বলছ সত্য, কিন্তু যেতে আমার মনে ইচ্ছেই হচ্ছে না। মন থেকে না এলে আমরা কখনও কিছু করি না। পূর্ব্ব থেকে পরিকল্পনা করে আমাদের কিছু কাজ হয় না। ভেতর থেকে হুকুম না এলে কিছুই করি না। দেখনা কাশীতে যাবার জন্য চিঠি ও টাকা এসে হাজির। আমার কিন্তু যাবার জন্য উৎসাহই হয় না।”

এইবার শ্রীশ্রীমহাপুরুষ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং অবশিষ্ট প্রসাদ আমাদের সকলকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর কথা উঠিল। মহাপুরুষজী বলিলেন, “তাঁর ফটো দেখলেই আমাদের সকল কথা মনে পড়ে। কিভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কত ভালবাসতেন, যত্ন করতেন—তা ভাবলে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। অবশ্য ফটো না দেখলেও সর্ব্বদা তাঁরই কথা আমাদের মনে ওঠে। কিভাবেই না তিনি আমাদের জীবন গঠন করে দিয়েছেন!”

মাদ্রাজের কোন পল্লীগ্রাম থেকে একখানা চিঠি এসেছে। মহারাজ আমাদের চিঠিখানা পড়িতে বলিলেন, আমরা পড়িলে মহারাজ বলিলেন, “দেখ, কত Girls' High School (উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়) শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে হয়েছে।” ভক্ত বলিলেন, “হাঁ, মহারাজজী, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব এখন সর্ব্বত্র। শিক্ষা ভিন্ন এ যুগে কল্যাণ নেই।”

মহাপুরুষজী—“হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে এই সব শিক্ষা হলে ধর্ম্ম ও অর্থ দু-ই হবে। এ ভিন্ন উপায়ও নেই।”

জনৈক ভদ্রলোক—“শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাইতে পারতেন?”

মহাপুরুষজী—“হাঁ, তিনি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। গানে তাঁর একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল। খুব মিষ্টি গলা ছিল। তিনি নিজেই বলতেন—‘আমি তো ওস্তাদ।’”

ক-মহারাজ—"স্বামীজী কিরূপ গাইতে পারতেন ?"

মহাপুরুষজী—"তিনি তো গানে সিদ্ধই ছিলেন। তিনি খুব যত্ন করে ছেলেবেলা হতেই গান শিখেছিলেন। তিনি উত্তম গান করতেন।"

ললিত মহারাজ— (ক-কে লক্ষ্য করে) "মহাপুরুষ মহারাজও কিন্তু ভাল গান গাইতে ও বাজাতে পারেন।"

ক- —"সত্য নাকি ? (মহারাজকে লক্ষ্য করে) দয়া করে, মহারাজ, আমাদের গান শুনান।"

মহাপুরুষজী—"এখন আমার সর্দ্দি রয়েছে, কি করে গাইব ? স্বামীজী নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি তো সকল বিষয়ে সিদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত লোকের কি কথা !"

ক- —"স্বামীজীর মধ্যে একাধারে এত গুণ !"

মহাপুরুষজী—"তাঁর আর কথা কি ! বিশেষ শক্তি নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

ম-বাবু—"স্বামীজীর কথা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর খুব শুনতেন।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, হাঁ।"

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী চাতকের গল্পটি বলিলেন। ন্যাংটা তোতাপুরী যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন সে কথাও বলিলেন। একদিন ঠাকুর হাততালি দিয়া ভগবানের নাম করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া তোতাপুরী ঈষৎ হাসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়াছিলেন, "ক্যা রোটী ঠোক্‌তে হো ?" অনন্তর কিভাবে তোতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন এবং মা-কালীকে মনিয়াছিলেন সেই সব প্রসঙ্গ হইল।

এবার অ-বাবু গান আরম্ভ করিলেন গৌরাঙ্গ-বিষয়ে হিন্দীতে।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী শুনিয়া বেশ আনন্দিত হইলেন এবং ললিত মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, ললিত, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমাদের এখন যে-কোন গানেই আনন্দ হয়। কারণ আমাদের তো সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নেই; তাই আমরা সকল রকম গান শুনেই আনন্দ পাই। অন্য অন্য সম্প্রদায় ৺কালীবিষয়ে গান হলে হয়ত উঠেই যাবে, আমাদের তা হবার জো নেই।" এবার গায়ক অ-বাবু বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন। মহারাজ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অ-বাবু অবিবাহিত শুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী বলিলেন, "তুমি যে-ভাবে জীবনযাপন করছ এ বড় উত্তম পথ। বিয়ে করলে লোকে আর সেরূপ থাকে না। সব মন, বুদ্ধি, ভালবাসা, টান স্ত্রীলোকের দিকে চলে যায়। ঐ মন দিয়ে আর ভগবানের সেবা হয় না। তুমি সৎভাবে জীবনযাপন কর, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। দেখ, এই সংসারে মান যশ বেশী দিন থাকে না। ভগবানই সত্য, তাঁর দিকে মন গেলেই ধন্য। আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

এবার সকলে আস্তে আস্তে প্রণাম করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহারাজও আহারের জন্য উঠিলেন।

*　　*　　*

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। স্থান—গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজজী ৺কালীদর্শন সম্বন্ধে বলিলেন, "দেখ, মাকে বাস্তবিক দর্শন লোকের হয় না। কি করে হবে? লোকের মন সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণে একটা আগ্রহ থাকা চাই। তাঁকে দেখব বলে মনে প্রথমেই একটা ব্যাকুলতা

আনতে হয়। এইরূপ মনের অবস্থা হলেই ঠিক ঠিক দর্শন হয়। তা না হলে মন্দিরে ঢুকলুম, মা মা বলে ছবার চীৎকার করলুম, আশে পাশে যত সব দেখবার তা দেখলুম—একে কালীদর্শন বলে না। তবে, হাঁ, এও মন্দের ভাল।"

ললিত মহারাজ—"মূর্ত্তি দেখলে মাকে মনে পড়ে, এজন্যই তো মূর্ত্তি?"

মহাপুরুষজী—"তা বৈ কি। তাঁকে মূর্ত্তির মধ্যে দেখলে তো সত্য সত্য তাঁর স্মরণ হয়। তিনি স্থূলভাবে এজগতে রয়েছেন। এই যে চণ্ডী—তিনি একবার সব বাইরে প্রকাশ করছেন, আবার ভেতরে। চণ্ডমুণ্ড মধুকৈটভ—এইসব বধ করে তিনি জগতের মঙ্গল করলেন।"

জনৈক ভক্ত—"এই যে চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি তিনি বধ করলেন, তা কি বাস্তবিক সত্য, না ভেতরে যে আমাদের সব রিপু আছে সেগুলিকে বধ করলেন?"

মহাপুরুষজী—"উভয়ই সত্য। দেবী স্থূলভাবে চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যদিগকে বধ করলেন। আবার সূক্ষ্মভাবে ধরতে গেলে আমাদের ভেতরে যে সকল রিপু আছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের নাশ করলেন।"

জনৈক ভক্ত—"এই জগৎ যে অনিত্য, অসত্য, তা সব মহাপুরুষই উপলব্ধি করে গেছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা নিরানব্বই জনই এই জগৎটা যে অসত্য তা বোঝে না—এর অর্থ কি? আমাদের অসত্যে সত্যবোধ কেন হচ্ছে?"

মহাপুরুষজী—"এই তো মায়া, তাঁর লীলা। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি যদি দয়া করে কাউকে বোঝান যে সংসার অনিত্য, তবে

সে বুঝতে পারে। তা ভিন্ন উপায় নেই। মানুষকে তিনি একটা 'অহং' দিয়ে রেখেছেন। মানুষ সেই 'অহং'টির জোরে আমি এই করবো, ঐ করবো মনে করে। আবার তিনি 'অহং' নাশ করে দিলেই মানুষ রক্ষা পায়। দেখ, মানুষ কি মজার! ঘাড়ের পিছনে কটা artery (ধমনী) আছে জানে না। আবার অহঙ্কার করে বেড়ায়। এই শরীরের কত যত্ন, কত প্রসাধন, কত কি করছে!"

জনৈক ভক্ত—"সত্যের উপর নিষ্ঠা ও অনুরাগ না হলে এ দেশের রক্ষা নেই।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, সত্য। তা ভিন্ন কি করে রক্ষা পাবে?"

মহারাজজী কথাপ্রসঙ্গে জার্ম্মানির কাইজারের কথা তুলিয়া বলিলেন, "দেখুন, কাইজার পাঁচ-সাত বৎসর প্রবল প্রতাপে কি যুদ্ধই না করেছিলেন! মনে করেছিলেন তিনি সবই করতে পারেন। এখন দেখুন, সেই কাইজারের কি অবস্থা! এখন তিনি কোথায়? মজাই এই—মানুষ মনে করে আমি সব করতে পারি। বাস্তবিক ভগবান যাকে যতটুকু শক্তি দেন, তিনি ততটুকুই করতে পারেন। ঠাকুরের সেই গল্প জানেন তো? গরুটাকে যতটুকু দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়, তার মধ্যেই সে ঘুরে বেড়ায়, আর মনে করে সে স্বাধীন। বাস্তবিক সে স্বাধীন কি?"

মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠিলে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী বলিলেন, "বাস্তবিকই গান্ধীজী উন্নত ব্যক্তি। তাঁর ইচ্ছা ছিল সকলকে নিয়ে উন্নত হন। তা কখন হয় কি? তিনি বেশ সত্যবাদী ও নির্ভীক।"

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। আজ মহালয়া। প্রাতঃকাল। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ কয়েক দিন যাবৎ উক্ত আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তাই এখানে ভক্তসমাগম খুব হইতেছে। আমরাও সকালে আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিলাম। তিনি সকলকে কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। জনৈক ভক্ত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনারা দিন-ক্ষণ অর্থাৎ বৃহস্পতি-বারের বারবেলা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি মানেন কি?"

মহাপুরুষজী—"মানি বৈ কি। শ্রীশ্রীঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেলা খুব মানতেন।"

ইহার পরে আমরা সকলে কালীঘাটে গেলাম। পূজনীয় মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে প্রার্থনান্তে মাকে স্পর্শ করিলেন। আমরাও সেইভাবে প্রণাম করিলাম। ললিত মহারাজ মাকে ফুল চন্দন দিলেন, একটি টাকা দেওয়া হইল। আমরা সকলেই মহাপুরুষজীর সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। মহাপুরুজী পূজারীকে একটি টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না এবং বলিলেন, "আপনার চরণধূলিই আমার যথেষ্ট।" দেখিলাম—মদের নেশায় যেমন পা টলে সেইভাবে টলিতে টলিতে ভাবস্থ হইয়া মহাপুরুষ মহারাজ কালীমন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে মা-কালীকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। ইহার পর নকুলেশ্বর দর্শন করিয়া আমরা যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন বেলা ৮-৩০টা। মহাপুরুষ মহারাজজী উপরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে

লাগিলেন। এই সময় জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া অ-বাবুর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিলেন। পীড়া সম্বন্ধে নানা কথার পর তিনি অ-বাবুকে ডাক্তার ব্লুনান সাহেবকে একবার দেখাইতে বলিলেন। ভদ্রলোক বিদায় গ্রহণ করিয়া উঠিলে মহাপুরুষজী তাহাকে বলিলেন, "দেখো, অ-বাবুকে বলো আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছি। অ-বাবু বড় ভক্তিমান, উদার ও সরল। গুরুতে তাঁর খুব ভক্তি বিশ্বাস আর সর্ব্বদাই ভগবানে বিশ্বাস আর ভগবানের দিকে মন রয়েছে।"

জনৈক ভক্ত বলিলেন, "তাঁর বাড়ীতে আজকাল কীর্ত্তন হয়।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, খুব ভাল লোক। দেখ, মানুষ ভাবে এক, হয় আর, সব upset (উল্টো) হয়ে যায়। এই ভাবছিলুম যোগেশ-বাবুর কথা; যোগেশবাবুর স্ত্রী ছিল, ছেলে ছিল। এখানে থাকতেন, সংসার করবেন বলে। তা না হয়ে হলো আশ্রম, সাধুদের বাস। কত ভক্তসমাগম! যোগেশবাবুর এখন পরমহংস অবস্থা। তিনি এখানে একবারও আসেন না, পাছে মনে হয়, এই অহংকার আসে যে আমি এই বাড়ী দান করেছি। তিনি এখন ব্রহ্মানন্দে ভাসছেন।"

অতঃপর পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী একটু বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিয়া ধন্য হইলাম। পরে একটি ভক্তকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "দেখ, আজ মাকে দর্শন করে বড়ই আনন্দ হলো। মার নিকট প্রথম প্রার্থনা করলুম, 'মা, বাংলার মঙ্গল কর। সকলের চৈতন্য সম্পাদন কর, সকলকে মানুষ কর।' ঠাকুর প্রার্থনা করতেন যাতে সকলে মানুষ হয়। দেখ, বাংলার বড়ই দুর্গতি। তাই বাংলার জন্য প্রার্থনা করলুম।

বাংলার অবস্থা এখন বড়ই খারাপ। তবে এই খারাপ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না। কালে সব ঠিক হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, মহারাজ সকলেই এবার বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। বাংলার দুঃখ দেখেই ভগবান এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাংলার মঙ্গল হবেই, সন্দেহ নাই।"

এবার আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মহারাজ অ-কে স্নেহভরে বলিলেন, "হাঁ, এসো, বেলা অনেকটা হয়েছে। খাবার সময় হলো।"

* * *

২৬শে অক্টোবর, ১৯২৫, সোমবার। গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। ৺শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা। মহাপুরুষ মহারাজজী ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা হইতেছে। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছোট ছেলেকে যেরূপ বাপ-মা ভালবাসেন, তিনিও আমাদের নিয়ে ঠিক তেমনি করতেন। বেশী জপধ্যান করতে দেখলে বলতেন, 'যা খেয়ে আয়, প্রসাদ খা, স্নান কর ইত্যাদি।' এমনি মিষ্টি কথা যে, লোকে গলে যেত। অনেক সময় আমরা অনেকে দক্ষিণেশ্বরে থাকতুম—অভিভাবকেরা গালাগালি দিতেন। তিনি আবার তাদের ডেকে বুঝিয়ে বলতেন, 'দেখ, ছেলেরা এখানে আসে তাতে তোমরা রাগ কর কেন? তোমরা কি পছন্দ কর না, ছেলে ভাল হোক? আমি তো ছেলেদের পড়তে নিষেধ করি না। বরং বলি—পড়বি শুনবি বৈ কি। এখানে এলে ভগবানে ভক্তি হবে, মানুষ হবে। বাপ-মা যে কত বড়, এরা সব বুঝতে পারবে।' অভিভাবকেরা এই সব কথা শুনে খুব খুশী হয়ে যেত।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মহাপুরুষজী আর বলিতে পারিতেছেন না। আমরা দেখিয়াছি ঠাকুরের কথা বেশী হইলেই মহাপুরুষ মহারাজ বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। স্বর গদগদ হইয়া যাইত। পরে বুদ্ধদেবের কথা উঠিল। তিনি বুদ্ধদেবের ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনী আমরা অনেকেই পড়িয়াছি, অনেকেই শুনিয়াছি, কিন্তু এমনভাবে কখনও শুনি নাই!

* *

২৭শে অক্টোবর, ১৯২৫। গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। প্রাতঃকাল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ৺জগদ্ধাত্রীপূজার আনন্দ ও ললিত মহারাজের কর্ম্মকুশলতার কথা বলিতে লাগিলেন। প্রশংসা করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। এমনই ভাব! বালকের ন্যায় সরল, উদার মহাপুরুষজী স্মিতহাস্যে প্রসাদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রহণ করিলেন। মুখে কালী কালী বুলি—যেন কালী ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। ক্রমে ভক্তগণ আসিলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহাকে মধুর কীর্ত্তন শুনাইলেন। মহারাজজী খুব আনন্দিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার মতসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বলিয়া আনন্দ দিলেন। উপস্থিত ভক্তগণও পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। একটি ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "দেখ, তাঁর নামে ডুবে যাবে, তবে তো হবে। তাঁর নামে একেবারে ডুবে যাবে, তবেই আনন্দ পাবে। ভাসা ভাসা ভাবে ডাকলে চলবে না। প্রাণে ব্যাকুলভাবে সব সময় তাঁর স্মরণ-মনন করতে হবে। তা না হলে সমস্ত দিন আজে-বাজে কাজ করে রাত্রিতে একটু জপধ্যান করেই মনে করো না যে সব মেরে দিলুম।

ভগবানের নাম সর্ব্বদা মনে মনে স্মরণ করবে। প্রথম অবশ্য হতে চাইবে না। একটু জোর করে অভ্যাস করলে পরে আর কষ্ট হবে না। মনই তখন নাম জপ করবে। বাবা, প্রথম একটু খাটো, পরে তাঁর কৃপায় দেখবে তিনি তোমার হাত ধরেই রয়েছেন। সাধন-ভজনের কাছে কি আর জিনিস আছে? পেট-চলার মত কাজ-কর্ম্ম করবে বৈকি—তাও তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাধন-ভজনের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। তোমরা আমাদের আপনার জন, তাই তোমাদের এত করে বলি। এখন যুবা বয়স, এখন জপধ্যান করার অভ্যাস না করলে পরে আর হবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কলিকালের জাগ্রত দেবতা। এমন সাধুসঙ্গ, এমন স্থান আর কোথাও পাবে না। দেখনা আমরা তীর্থে তীর্থে না ঘুরে ঠাকুরের দরজায় পড়ে রয়েছি। বাজে সময় নষ্ট না করে কেবল তাঁর প্রসঙ্গ করবে। পরস্পর তাঁর কথাই আলোচনা করবে। এমন আদর্শ পেয়েও যদি তোমরা কিছু না কর, তবে পরে অনুতাপ করতে হবে। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ তোমাদের সামনে ধরেছি, এখন তোমরা এই বেলা জীবনগঠন করে নাও। আপদ-বিপদে তিনিই একমাত্র আশ্রয় জেনো। শ্রীশ্রীঠাকুরই সত্য, আর সব অনিত্য মনে রেখো।”

উপস্থিত ভক্তগণ এই সমস্ত উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া সাধন-ভজনের জন্য প্রাণে অত্যন্ত উৎসাহ লাভ করিলেন।

* * *

৭ই নভেম্বর, ১৯২৫। বেলা ৪টার সময় বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম।

তিনি আমাদের সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। জনৈক ভক্ত কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "মহারাজজী, শুনলুম আপনি নাকি কাশী যাবেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, তবে কবে যাব ঠিক নাই। একদিন গেলেই হল। দু-চারখানা কাপড় নিলুম, চলে গেলুম। আবার কি? তবে শীত পড়েছে—কাশীতে শীত খুব বেশী। একটু গরম জামা চাই।" উপস্থিত এক ভদ্রলোক মহারাজের জন্য একটি ফ্লানেলের সার্ট আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "না, কিছু প্রয়োজন নেই। গরম কাপড় তো রয়েছে, তাতেই হবে। কাশীতে যখন ছিলুম তখন গরম কাপড়ের অভাবে তূলোর কোট ও বালাপোশ গায়ে দিতুম। ঐ সব দেশে তাতেই শীত কাটে।"

কয়েকজন স্ত্রীভক্ত আসিয়া মহারাজজীকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে বসিতে আজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাঁর নামে ডুবে যাবে, তবে তো হবে। তাঁর নামে ডুবে যেতে হবে, তবে তো শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। নিয়ম করে সাধন-ভজন করবে। কোন দিনও বাদ দেবে না। হাঁ, কাজের তাড়া থাকলে অন্ততঃ পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে প্রার্থনা সেরে নেবে। তোমার আন্তরিকতা থাকলে ভগবান তোমার এই সামান্য সময়ের প্রার্থনাও শুনবেন। চাই হৃদয়ের আন্তরিকতা, ভাসা ভাসা থাকলে চলবে না, ব্যাকুল হতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—ব্যাকুলতা জীবনে না এলে কিছু হবে না। তোমরা এবার ঠাকুরঘরে যাও। ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, তাঁকে প্রাণভরে মনের কথা জানাও, তিনি তোমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনবেন। যাবার সময় প্রসাদ নিয়ে যাবে।"

স্ত্রীভক্তগণ চলিয়া গেলেন। আমরা ৬।৭ জন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর পাদমূলে বসিয়া রহিয়াছি। উপস্থিত জনৈক ভক্ত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট বসলে বড় শান্তি পাই।"

মহাপুরুষজী—"বসোনা, এখনও তো স্টীমারের দেরি আছে।"

ভক্ত—"মহারাজ, 'বেদান্ত কেশরী'তে আপনার সম্বন্ধে একটা কথা দেখলুম।"

মহাপুরুষজী—"কি, কোথায় দেখলে?"

ভক্ত—"এই আপনার নিকটই 'বেদান্ত কেশরী' আছে। তাতে পড়লুম।"

মহাপুরুষজী—"কি লিখেছে?"

ভক্ত টেবিল হইতে 'বেদান্ত কেশরী'খানা লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পড়িলেন। তাহাতে ইংরেজীতে এই রকম লেখা ছিল—"শ্রীশ্রীঠাকুর কালীঘরে যাইয়া প্রণাম করিলেন, ফিরিবার সময় তারককে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং সস্নেহে তারকের মুখচুম্বন করিলেন।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। ঠাকুর আমাদের খুব ভালবাসতেন, তাই এমন করতেন। কোথা হতে একথা তারা পেলে?"

ভক্ত—"'Gospel of Sri Ramakrishna' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ) থেকে।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, মাষ্টার মশায় ইংরেজীতে 'Gospel of Sri Ramakrishna' লিখেছেন বটে।"

এই বলিয়া কি প্রকারে 'কথামৃত' লেখা হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এই যে 'কথামৃত' লেখা হলো তখন আমরা কেউ জানিনে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ভাল ভাল উঁচু কথা

বলতেন, তখন মাষ্টার মশায়কে বলতেন, 'মাষ্টার, এই কথা শুনে রাখ, এ বড় ভাল কথা।' মাষ্টার মশায় চুপ করে বসে থাকতেন ও সব শুনতেন। আমরা তখন মনে করতুম, মাষ্টার মশায় বিদ্বান লোক, তাই ঠাকুর তাঁকে এইভাবে ঐ সব কথা বলতেন। মাষ্টার মশায় ঠাকুরের এই সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বাড়ী গিয়ে খুব সংক্ষেপে প্রায় shorthand (ক্ষিপ্রলিপি)-এর মত ভাবায় লিখে রাখতেন। আমরা তো কিছুই জানিনে। অনেক কাল পরে মাষ্টার মশায় ঐগুলি শ্রীশ্রীমাকে শোনাতেন। তখন শ্রীশ্রীমা নীলাম্বর বাবুর বাগানে থাকতেন। যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) তখন তাঁর সেবক ছিলেন। একদিন মাষ্টার মশায় চুপিচুপি সব পড়ে শোনাচ্ছেন। উপরের ঘরে অন্য কোন লোক নেই। যোগীন মহারাজের মনে হলো—আচ্ছা, মাষ্টার চুপিচুপি শ্রীশ্রীমাকে কি শোনাচ্ছেন? তাই তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে আরম্ভ করলেন। মাষ্টার মশায় শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সব লিখে শোনাচ্ছেন, শ্রীশ্রীমাও তা শুনে খুব আনন্দিত হয়ে বলছেন যে, সব ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে। শ্রীশ্রীমা মাষ্টার মশায়কে খুব আশীর্ব্বাদ করলেন এবং ছাপাবার আদেশ দিলেন। বললেন—এতে জীবের অশেষ কল্যাণ হবে।

"এখন এই 'কথামৃত' অবলম্বন করে কত লোকের চৈতন্য হচ্ছে। অনেক ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিত অবস্থায় সুরেশ দত্ত 'শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও তাঁর উপদেশ' বার করেছিলেন। অক্ষয় সেন—যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' লিখেছেন—জগতের অনেক মঙ্গল করলেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন,

ভক্তিমান, বড় গরীব ছিলেন। তিনি 'পুঁথি'তে যে সব facts (ঘটনা) দিয়েছেন তা অতি সুন্দর। আমরা এত facts (ঘটনা) জানতুম না। অক্ষয় সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার বহুলোকের নিকট থেকে এবং শিহড়, কামারপুকুর প্রভৃতি জায়গায় নিজে গিয়ে সব facts (ঘটনা) জোগাড় করেছেন এবং অতি সরল ভাষায় গ্রামের ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পদ্যে লিখেছেন। বিদ্বান লোকও এখন এই 'পুঁথি'র আদর করছেন। তিনি তো বিদ্বান লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মনের আগ্রহ ছিল খুব। আমরা শুনেছি, যখন তিনি এই বই লেখেন তখন আহিরীটোলাতে সামান্য কাজ করতেন। রাত্রিতে তিনি এই বই লিখতেন। আরও শুনেছি, তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব্যাকুলভাবে ডাকতেন ও অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করতেন—'ঠাকুর, তুমি আমায় শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার অমূল্য জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারি।' তারপরই একটা inspiration (প্রেরণা) আসত—অমনি বাসায় এসে 'পুঁথি' লিখতেন। এই 'পুঁথি' অতি সুন্দর হয়েছে। অল্পদিন হল তিনি দেহত্যাগ করেছেন। 'পুঁথি'র copyright (স্বত্বাধিকার) 'উদ্বোধন'কে দিয়ে গেছেন। এখন এরা 'পুঁথি' ছাপাচ্ছে। অক্ষয়বাবু মৃত্যুর কিছু দিন আগে বড় অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। 'উদ্বোধন' এই 'পুঁথি'র copyright (স্বত্ব) ক্রয় করে বোধ হয় কিছু অর্থসাহায্য করেছিল।"

কথাপ্রসঙ্গে নূতন Viceroy (বড়লাট) আরউইন সম্বন্ধে কথা উঠিল। তাঁহার কৃষিপ্রীতির কথা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "এখন আমাদের দেশে agriculture-এর (কৃষির) বড় অভাব হয়েছে। ইনি যদি এ দিকে মন দেন, তবে বেশ ভাল হয়। Co-operation

(সহযোগিতার) দ্বারাই East (পূর্ব্ব) ও West (পশ্চিম)-এর মিলন হবে, তাতেই শান্তি হবে—স্বামীজীর এই মত ছিল। স্বামীজী যেন বহুকাল হতেই এদেশের সব ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর ideal (আদর্শ) নিলেই দেশের ঠিক ঠিক কল্যাণ। মহাত্মা গান্ধীও স্বামীজীর অনেক ideas (ভাব) নিয়েছেন। স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'এমন ছেলে আসেনি, আসবে না।' দেখ, স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কত চিন্তা করে সব রকম সমস্যার সমাধান করে গেছেন। এখন লোকে একটু একটু বুঝেছে, ক্রমে আরও বুঝবে। মহাত্মা গান্ধী non-co-operation (অসহযোগ) প্রচার করে সাহেবদের ঘৃণা করতে কখনো বলেননি। কেবল বলেছেন—তোমরা থাক, আমরাও থাকি, সমান সমান স্বার্থ থাকুক।"

জনৈক ভক্ত বলিলেন, "আজকাল আমাদের নাগ মশায়ের জীবনী পড়া হচ্ছে।"

মহারাজ বলিলেন, "তা বেশ। আহা, নাগ মশায়ের কি ভক্তি, বিশ্বাস! আমাদের দেখলে বলতেন, 'কৃপা—কৃপা'। এ ছাড়া কোন কথাই ছিল না। স্বামীজী বলেছিলেন, 'নাগ মশায় আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন; আমরাও অবশ্য বিনয় জানি, কিন্তু নাগ মশায়ের মত অতটা পারি না'। নাগ মশায় সর্ব্বদা একটা ভাবে থাকতেন—সর্ব্বদা তন্ময় অবস্থা। চক্ষু দুটি সব সময় লাল হয়ে থাকত। এমন লোক দেখা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ভালবাসতেন, বলতেন—'জলন্ত আগুন'। গিরিশবাবু কিন্তু সুন্দর উপমা দিতেন, বলতেন—'স্বামীজীকে মহামায়া বাঁধতে লাগলেন; স্বামীজী এত বড় হলেন যে মহামায়া দড়িতে আর নাগাল পেলেন না। আর নাগ মশায়

এত ছোট হলেন যে মহামায়া আর তাঁকে বাঁধতেই পারলেন না'।" উপস্থিত সকলে মহারাজের এই সব কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরে মহারাজ গিরিশবাবুর কথা তুলিয়া বলিলেন, "আহা, কি সব বই তিনি লিখেছেন! কি চমৎকার কথা—'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন, বলতেন—'গিরিশের আমার পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস। এমন কারো নেই।' গিরিশবাবু বড় চমৎকার লোক ছিলেন, আমরা প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে খেয়েছি; তাঁর সঙ্গে মিশেছি।"

এইবার ঘড়ি দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "৭-৩৫ বেজেছে, তোমরা এবার এসো। তোমাদের ষ্টীমারের সময় হয়েছে।" অ-বলিলেন, "একদিন আপনার জীবনী শুনবো, আপনি আমাদের বলবেন।" মহারাজ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "আমাদের আবার জীবন! শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা। আচ্ছা, একদিন তোমাদের বলব।"

আমরা সকলে ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আজ যে কি আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় লিখিবার নহে। হৃদয়ের জিনিস যেন হৃদয়েই থাকে। আমার ৬টা হইতেই পেটে বেদনা হইতেছিল। মহাপুরুষজীর এই সকল অমৃতময়ী বাণী শুনিতে শুনিতে বেদনা যে কোথায় লুকাইয়াছিল জানিতেই পারি নাই! সত্য সত্যই মনে হইল—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

১১ই নভেম্বর, ১৯২৫। বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বসিয়া আছি। জনৈকা মহিলাভক্ত আসিয়া প্রণাম করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করুন, মরবার সময় যেন ঠাকুরের নাম স্মরণ করে মরতে পারি। যদি মুখে নাও পারি, অন্ততঃ মনে মনে যেন তাঁর নাম ভুল না হয়। আমার মৃত্যুভয় নেই।"

মহাপুরুষজী—"কেন তোমাদের ভয় থাকবে? ঠাকুর তোমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন, ভয় কি? ভক্তদের জন্য যমদূত-ফুত নেই। ভক্তেরা ঠিক ভগবানের নিকট চলে যায়। তোমরা কোন ভাবনা কোরো না। ঠাকুর, মা তোমাদের সর্ব্বদাই দেখছেন।"

উক্ত মহিলা খুব আশান্বিতা হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পূজনীয় মহারাজজী এবার গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিলেন। সঙ্গে দুই-তিনজন ভক্ত আছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। এমন সময় তিনি অস্ফুট স্বরে আচার্য্য শঙ্করের 'মোহমুদ্গরের' সেই পরিচিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" ইত্যাদি

উপস্থিত আমাদের বলিলেন—"এই সব বৈরাগ্যের গান বড় সুন্দর। আমরা আগে এই সব গান গাইতুম। বাঃ, ওপারে বেশ হরিনাম হচ্ছে; গঙ্গার তীর, তাতে হরিনাম বড়ই ভাল।" এইবার তিনি গান ধরিলেন—"সুরধুনীর তটে কে হরিনাম করে?"

ভা-মহারাজ বলিলেন, "এই গানটি বড়ই সুন্দর। আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুরের প্রথম ফটো কে তোলেন?"

মহাপুরুষজী—"ভবনাথ প্রথম তাঁর এক বন্ধুর দ্বারা তোলেন। ঐ ভদ্রলোক বরাহনগরে থাকতেন।"

ভা-মহারাজ—"ঠাকুরের চেহারা কেমন ছিল ?"

মহাপুরুষজী—"তিনি খুব লম্বা ছিলেন না। চলনসই চেহারা ছিল, বুক খুব প্রশস্ত ছিল।"

ভা-মহারাজ—"আপনাদের চেহারা তখন বোধহয় ভালই ছিল।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, কঠোর করে সকলের দেহ ভেঙ্গে গেল। স্বামীজী ৩৯ বৎসরে দেহত্যাগ করলেন। যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) তার আগেই দেহ রাখলেন। সবাই একে একে চলে গেলেন।"

ভাবস্থ হইয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—"হরিনামই সত্য। মা, জগতের মঙ্গল কর, সকলকে চৈতন্য দাও।"

আমাদের পরিচিত ভক্ত -বাবু আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার দীক্ষার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপুরুষজী—"দেখ, আমরা অন্য কোন দীক্ষা জানি না, আমরা জানি ঠাকুর ও তাঁর পতিতপাবন নাম। এই গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলছি, আমরা এই সার জানি। ঠাকুরের নাম করে যাও। এর চেয়ে বড় দীক্ষা আমরা কিছু জানি না। আমরা তো ভট্চাজদের মত দীক্ষা দেই না। 'রামকৃষ্ণনাম'—এই তো দীক্ষা। ঠাকুরঘরে গিয়ে তোমাকে এই পতিতপাবন নামই দেব। আমাদের কোন secret (গোপন) নেই। তিনি এসেছিলেন যুগাবতাররূপে। যে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে, মুক্ত হয়ে যাবে, এতে কোন সংশয় নেই।"

মহাপুরুষজী তন্ময় হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত দীপ্তি। কথাগুলি তড়িৎশক্তির ন্যায় সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল। আমাদের কাহারও সাহস হইল না যে আর কোন কথা বলিয়া তাঁহার এই ভাবতন্ময়তা ভঙ্গ করি। অতঃপর আমরা নিঃশব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি দর্শন করিতে চলিলাম। তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহারাজও আস্তে আস্তে আপনার শয়নঘরের দিকে গেলেন। আরতির পরে আবার ক্রমে সকলে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে আসিয়া বসিলাম।

জনৈক ভক্ত—"মহারাজ, কেমন আছেন?"

মহাপুরুষজী—"শরীর ভাল নেই। বাত, সর্দ্দি। তুমিও যেমন—এই বুড়ো শরীর, এখন তো এই সব হবেই।"

তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে।

ভক্ত—"আমার সামনে আপনি বুড়ো শরীর বলবেন না, আমার প্রাণে বড়ই লাগে।"

মহাপুরুষজী—"বুড়ো শরীরকে বুড়ো বলবো না? এই শরীরের সঙ্গে তো মায়িক সম্বন্ধ। সত্তর বছর বয়স কি কম? এই শরীর দু'শ বছর বেঁচে থাকলেও কি উপকার হবে? যাক সে কথা, ঠাকুরের যেরূপ ইচ্ছা তাই হবে। আমাদের এ সব কথায় কাজ কি?"

এই সময় জনৈক ভক্ত তাঁহার পুত্রের সহিত আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ছেলেটির দীক্ষার কথা বলিলেন। ছেলেটির বয়স বার-তের হইবে।

মহাপুরুষজী—"তুমি গায়ত্রী জপ কর তো?"

"রোজ করি না", বলিয়া ছেলেটি মাথা অবনত করিল।

মহাপুরুষজী—"এই জন্যই ছোটছেলেদের দীক্ষা দেই না। মন্ত্র নিলে রোজ জপ করতে হবে। তুমি পারবে তো? গায়ত্রী রোজ জপ করবে। মন্ত্র নিলে রোজ সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসবার সময় যতটুকু পার মন্ত্রজপ করবে। মন্ত্রজপ না করে কিছু খেতে পারবে না। তুমি স্কুলে পড়, সময় বেশী পাবে না, তাই সকালে পড়বার সময় পাঁচ-সাত মিনিট জপ করে পড়তে বসবে।"

"হাঁ, তাই করব"—বলিয়া ছেলেটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমাদের আফিসের কে-বাবু আসিয়া মহারাজজীকে প্রণাম করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কৃপা পাইয়াছিলেন।

কে-বাবু কথাপ্রসঙ্গে রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) ভালবাসার কথা বলিলেন, "আমরা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) মহারাজের নিকট কত ভালবাসাই পেয়েছি!"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তোমাদের খুবই ভালবাসতেন আমরা জানি।"

কে-বাবু—"মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজই আমাদের সব ছিলেন। আপনাকে কি বলব? এমন আমাদের সব ঘটনা হয়েছে,—রাত্রিতে বাড়ীতে শুয়ে আছি, প্রাণ ছটফট করতো মহারাজকে দেখবার জন্য। এক দিনের ঘটনা বলি। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, ১১টা, এমন সময় মন ব্যাকুল হল মহারাজকে দেখবার জন্য। তখনই বাসা হতে রওনা হলুম। কুমারটুলি ঘাটে এসে দেখি ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি আরও দু-তিন জন মহারাজের ভক্ত ঘাটে দাঁড়িয়ে

আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? উত্তর দিলেন—মশাই, মহারাজকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। আমি তো শুনেই বুঝে নিলুম। এদের মনের অবস্থাও আমারই মত। তখন একত্রে একখানা নৌকা করে বেলুড় মঠে এলুম। মঠে এসে মহারাজকে দর্শন করতে চললুম মহারাজের ঘরে। তখন অনেক রাত্রি। মঠে সব সাধুরা ঘুমিয়েছেন। আমরা আস্তে আস্তে মহারাজের ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি মহারাজ যেন কার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমাদের দেখেই বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের কিছু প্রসাদ দিতে পার, বাবুরামদা?' বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'চার-পাঁচ জনের জন্যে প্রসাদ তৈরীই আছে।' আমরা প্রসাদ পেলুম। তৎপরে মহারাজকে পুনরায় প্রণাম করে তৃপ্ত হৃদয়ে অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরলুম।"

মহাপুরুষজী—"অন্য লোক মহারাজের ভালবাসার কথা বুঝতে পারে না সত্যিই। মহারাজের এমনি টানই ছিল ভক্তদের উপর!"

কে-বাবু—"মহারাজই আমাদের সব। এমন কি জপ-ধ্যানও বেশী করতে পারি না। কেবল তাঁর অহেতুক কৃপার কথাই সর্ব্বদা স্মরণ করে চোখের জলে ভাসি। এমন ভালবাসা আর কোথাও পাব না।"

মহাপুরুষজী—"তোমাদের জপ-ধ্যানের দরকার কি? তোমরা তাঁর স্মরণ-মনন করছ, তাঁর অহেতুক কৃপার কথা ভাবছ। আবার কি? তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। তিনি তোমাদের ভার নিয়েছেন। তিনিই তোমাদের সব দেখছেন। তোমরা সব আনন্দে থাক।"

* * *

১৪ই নভেম্বর, ১৯২৫। বিকাল ৪ টায় বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। ঠাকুর দর্শন করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীর পদপ্রান্তে গিয়া বসিলাম।

জনৈক ভক্ত—"মহারাজ, আপনি আমাকে কৃপা করুন।"

মহাপুরুষজী—"তোমরা যেখানেই থাক তাঁকে সর্ব্বদা স্মরণ-মনন করবে, কাতরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করবে, তিনি বড় কৃপালু। তোমাদের কৃপা করবার জন্যই শ্রীভগবান এবার নরশরীর ধারণ করে জগতে এসেছিলেন। কত কঠোর সাধনা করে তার ফল তোমাদের জন্য রেখে গেলেন, যাতে তোমরা ঠিক ঠিক মানুষ হয়ে ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করতে পার।"

জনৈক ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে ব্যবসায়ের কথায় বললেন—"আজকাল মিথ্যা কথা না কইলে ব্যবসা চলে না।"

মহাপুরুষজী—"মিথ্যা কথা বলবে কেন? ঠিক ঠিক দর বলবে, যদি খরিদ্দারের ইচ্ছা হয় নেবে, না হয় না নেবে। মিথ্যা কথা কেন বলবে? সত্য নিশ্চয়ই বলবে। আজকাল অনেকে দর করা পছন্দও করে না।"

ম-বাবু—"আমার আত্মীয়া শ্রীমতী- আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, মেয়েটি খুব সৎ ও উদার। তার খুব ভক্তি-বিশ্বাস। দেখুন, ম-বাবু, ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস হলে মানুষের কখনও গোঁড়ামি থাকে না। সে তার ইষ্টকে সর্ব্বভূতে দেখে। ঐ দেখুন না, এই মেয়েটি অন্য সম্প্রদায়ের, তবুও ঠাকুরের উপর কেমন নিষ্ঠা, ভক্তি!"

জনৈক ভক্তকে মহাপুরুষজী বলিতেছেন—"দেখ, জগতে সব

জিনিসেই ভয় আছে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, 'কেবল বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় (বৈরাগ্যমেবাভয়ম্)।' ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে লোক ধন্য হয়। সাধু ও গৃহস্থ উভয়েরই সংযমী হতে হয়। সংযম ভিন্ন কিছু হবার জো নেই, তোমাদের অত লাখ লাখ জপ করতে হবে না। যা পার ভাবের সহিত করে যাবে, আর সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে। তোমাদের এই জন্মেই মুক্তি হয়ে যাবে।"

জনৈক ভক্ত—"মহারাজ, ধ্যান কেন হয় না?"

মহাপুরুষজী—"ধ্যান করবার সময় ভাববে যে, তোমার ইষ্ট একটি ফুটন্ত পদ্মের উপর বসে আছেন, আর তাঁর শরীর থেকে একটি জ্যোতি বেরুচ্ছে; তুমি তাই দেখছ আর প্রার্থনা করছ। এইভাবে ধ্যান করে নিও, ঠিক হবে, অবশ্যই ভগবানের দর্শন পাবে।"

* * *

৩রা জানুয়ারী, ১৯২৬, বেলুড় মঠ। জনৈকা স্ত্রীভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেছেন, "দেখ মা, এই সংসার দু'দিনের জন্য—এই আছে, এই নাই। তিনিই সত্য, তাঁকে ডাকাই পরম লাভ।"

পরে জনৈক ভক্তের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ভক্ত—"মহারাজ, যখন রাস্তায় গরীবদের দেখি—কারো হাত, কারো বা পা নেই, অন্ধ, তখন প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়, তখন ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, 'প্রভু, তুমি জগতের দুঃখ-কষ্ট দূর করতেই এসেছিলে, এদের দুঃখ দূর কর'।"

মহাপুরুষজী—"তুমি ঠিক প্রার্থনা করছ। হাঁ, এইরূপ প্রার্থনা বড়ই ভাল, এতে ভগবান খুব খুশী হন। নিজের জন্য তো লোকে সব সময়েই প্রার্থনা করে, কিন্তু পরের জন্য কে প্রার্থনা করে বল?

এভাব বড়ই সুন্দর। তুমি নিশ্চয়ই এই প্রার্থনা করবে। এতে জগতের নিশ্চয়ই কল্যাণ হয়।"

অপর এক ভক্তকে বলিতেছেন, "দেখ, তোমাদের ঠিক বলছি, এখন আমাদের কোন plan (সঙ্কল্প) নাই ; তিনি যেখানে নিয়ে যান তাতেই রাজী। একটুও plan (সঙ্কল্প) করি না। ঝড়ের এঁটো পাতার কথা ঠাকুর বলতেন। আমাদেরও এখন সেই অবস্থা। জানি তিনি আমাদের মন্দ জায়গায় নিয়ে যাবেন না—এই বিশ্বাস আছে।" জনৈক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কার কাছে দীক্ষা নিয়েছ ?"

সাধু—"শ্রীশ্রীমার কৃপা পেয়েছিলাম।"

মহাপুরুষজী—"তুমি খুব প্রার্থনা করবে—মা, আমি বড় দুর্ব্বল, আমাকে বল দাও, বুদ্ধি দাও, ভক্তি-বিশ্বাস দাও। তিনি তোমার প্রার্থনায় সব দিয়ে দেবেন, তুমি আপ্তকাম হয়ে শ্রীশ্রীমার কাছে চলে যাবে।"

কথাপ্রসঙ্গে কু-বাবুকে বললেন—"টাকা লোকে কী ভাবেই ভালবাসে! এ এক মস্ত মায়া। লোকে টাকা টাকা করে পাগল। এবার শ্রীশ্রীঠাকুর এই কামিনীকাঞ্চন কিভাবে ত্যাগ করতে হয় দেখিয়ে গেলেন। তোমরা টাকার জন্য বেশী ভেবো না। তিনি তোমাদের মোটা ভাত মোটা কাপড় দেবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই একথা বলে গেছেন।"

* * *

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭। বেলা ৬টার সময় মঠে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে গিয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। একঘর লোক। তিনি দশ মাস পরে উতকামণ্ড হইতে সবে মাত্র বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন। জনৈক ভদ্রলোক গভীর শোক পাইয়া শান্তিলাভের আশায় আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, তুমি এটি করবে—যাই হোক বাবা, ভগবানকে যেন ভুল না হয়। তিনিই একমাত্র সত্য। দেখ, সংসারের অনিত্যতা আর লোককে বুঝাতে হয় না। সকলেই দিনরাত চোখের উপরে তা দেখছে। যে অবস্থাতেই থাক তাঁকে রোজ ডাকবে, প্রার্থনা করবে। এই হচ্ছে সার কথা। নিজের এই শরীরই যখন থাকবে না তখন কার জন্য শোক করবে? প্রাণের সহিত তাঁকে ডাকতে হবে, তা না হলে কেবল মালা ঘুরিয়ে নিয়মরক্ষা করলে চলবে না, খুব ডাকবে একমনে। আহার নিদ্রা প্রভৃতির জন্য সময় আছে, না করলে চলে না, সেরূপ ভগবানকে সময় করে compulsory (আবশ্যিক) ভাবে ডাকতে হবে; তবে তো শান্তি প্রাণে আসবে, বাবা। তুমি তাঁকে ভুলো না। তাঁকে ভুলে গেলে সবই গোলমাল হয়ে যাবে।"

ক-বাবু—"মহারাজ, মা আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।"

মহাপুরুষজী—"তোমার কি ইচ্ছা?"

ক-বাবু—"আমার তো বিয়ের ইচ্ছা নেই।"

মহাপুরুষজী—"তা হলে খুব firm (দৃঢ়) থাকবে। কোনমতেই yield (মতত্যাগ) করবে না। মা দুঃখিত হবেন বলে তুমি মনে কিছু করো না। মাকে সব বুঝিয়ে বলবে, তিনিও তো সবই সংসারের অবস্থা দেখছেন।"

এবার পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মঠের

কুকুরটি দু-তিন দিন হল পালিয়ে গেছে, অনেক খোঁজ করেও আমরা পেলুম না।”

মহাপুরুষজী—“কুকুর প্রভুভক্ত হয়, কিন্তু এই কুকুরটি বড় indifferent (উদাসীন) ছিল। সাধুদের কুকুর কিনা—ও বেটাও সন্ন্যাসী ছিল।”

উপস্থিত ভক্তগণ মহাপুরুষজীর কথায় হাসিয়া উঠিলেন।

এবার মহাপুরুষজী বেড়াইবার জন্য নীচে নামিলেন এবং ফুলের বাগানের দিকে চলিলেন। একজন ভক্ত ডাক্তার প্রণাম করিয়া শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে মহাপুরুষজী বলিলেন, “তুমিও যেমন, এ শরীর একদিন যাবেই। তবে কেন ব্যস্ত হব? এখন তো ৭৩ বৎসর চলছে, good old age (বেশ বুড়ো বয়েস)। শরীর যায় তো যাবে।”

আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে আরতি দর্শন করিতে গেলাম।

* * *

৫ই মার্চ্চ, ১৯২৭। কথাপ্রসঙ্গে চা-বাবু মহাপুরুষজীর শরীরের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাপুরুষজী—“দেখুন, চা-বাবু, আমার কোন অসুখ নেই। এই শরীরটারই যত ব্যাধি। তিনি ঠিক আছেন, ঠিক থাকবেন। হোক না শরীরের যা ইচ্ছা, আত্মা ঠিক আছেন। সেখানে সুখ-দুঃখ-ব্যাধি কিছুই নেই। শরীরটা আছে বলেই এ সব হচ্ছে ও হবে। সেই চৈতন্যময় ভেতরে আছেন বলেই তো চৈতন্যে আছি। এসব বিচার করলে আর শরীরের ব্যাধির জন্য ভাবতে হয় না। এখন একমাত্র

তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তাঁর অপূর্ব্ব লীলা দেখছি। আপনি তো বুদ্ধদেবের বিষয় অনেক চর্চ্চা করেছেন, দয়া করে আর একদিন আসবেন। আপনার সঙ্গে এইসব বিষয়ে কথা হবে। আহা! বুদ্ধদেবের মত এমন দয়ার মানুষ আর কে? তিনি জগৎকে শান্তি দেবার জন্য কি কঠোর সাধনাই না করে গেছেন! স্বামীজী তাঁর কথা বলতে বলতে একেবারে মেতে যেতেন। আমরাও তাঁর কথা শুনে বড় আনন্দ পাই।"

পাবনার জনৈক ভক্ত আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি 'কথামৃত' পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, তাঁর কৃপাও পেয়েছি।"

মহাপুরুষজী—"এই যে অহেতুক কৃপার কথা শাস্ত্রে আছে তা অতি সত্য। যখন অবতার আসেন তখনই তার প্রমাণ হয়। আমরা দেখছি তিনি বিনা কারণে, বিনা হেতুতে কৃপা করে থাকেন। গীতায় তিনি বলেছেন—'দেখ, পার্থ, আমার এই ত্রিলোকে কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নেই। কিন্তু তবুও আমি কার্য্যে লিপ্ত আছি। কেননা আমি কর্ম্ম না করলে এই জীবসকল কেহই কর্ম্ম করবে না। তাই আমি সদা কর্ম্মে লিপ্ত আছি' (গীতা ৩।২২)। দেখুন, অবতার যখন আসেন, সব দিক পূর্ণ হয়ে যায়।"

ভক্ত—"মহারাজ, কেন তিনি কষ্ট করে জন্মগ্রহণ করেন? তিনি এই শরীরপরিগ্রহ না করেও তো তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন।"

মহাপুরুষজী—"তিনি শরীর পরিগ্রহ করে লীলা করেন; মানুষ তাঁকে দেখে, তাঁকে ভালবেসে, তাঁর সংস্পর্শে এসে জীবন তৈরী করে নেয় এবং তাঁর সেবা-বন্দনা করে মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের রূপ ধরে আসাতে মানুষ তাঁকে ভালবাসার সুযোগ পায়। তা ভিন্নও মানুষ

মানুষের মতই একজনকে তার আদর্শ চায়, তা না হলে কি করে সেই বিরাট ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারবে ?"

ভক্ত—"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর যে অবতার এই কথা আপনারা তখন বুঝেছিলেন কি ?"

মহাপুরুষজী—"না, তখন কি আমরা অবতার এসব বুঝি ? তবে এটি সত্য বুঝেছিলুম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসার মত ভালবাসা জীবনে কোথাও পাইনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে গেলে মনে হত যেন ঠিক মায়ের কোলে এলুম। বহুদিন পরে ছেলে যেমন বাড়ীতে গিয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ায় ও আনন্দ পায়, ঠিক সেরূপ মনে হত। অবশ্য এটা আমার feelings (ভাব) বলছি। তাঁর এমন ভালবাসা ছিল, আমরা তাঁকে না দেখে থাকতে পারতুম না। সংসারে এই রকম নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিরল। ছোটছেলেরা এদিক সেদিক খেলা করে, মনে ভয়ও থাকে, কিন্তু যখন মায়ের নিকট আসে তখন নির্ভয়ে মায়ের কোলে থাকে। আমাদেরও তেমনি মনে হত। এই যে আপনারা আসেন, আমাদের ভালবাসেন—এ দেখে আমাদেরও কত আনন্দ হয়। ঠাকুর তাঁর অসীম ভালবাসাই আমাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু দিয়ে রেখেছেন, তাই আপনাদের আমরা এত ভালবাসতে পারছি। আপনারা কত বাধা বিপদ ঠেলে আমাদের কাছে আসেন। আপনাদের এখানে এলে আনন্দ হয়, আমাদেরও আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়।"

এবার সকলে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনিও সকলকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে আনন্দে থাকুন।"

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

১৯শে মার্চ, ১৯২৭, বেলুড়মঠ। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর ঘরে আনন্দের হাট। শনিবার বলিয়া ভক্তসমাগম অধিক। মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে সকলেই গভীর প্রশান্তি বোধ করিতেছেন। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলিতেছে।

ভক্ত—"মহারাজ, যতক্ষণ আপনাদের নিকট থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলিয়া যাই।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ। এরূপ যত আমাদের সঙ্গ করবে, সাধুসঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ হবে, কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো সহজ কথা নয়। তবে আমরা প্রত্যেকে তাঁকে দেখেছি। আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনলে ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস পাকা হয়ে যাবে। তোমাদের দিন দিন আরও ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে।"

ভক্ত—"মহারাজ, 'কথামৃত' পড়ে কত আনন্দ পাই। 'কথামৃত' পড়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, তা হবে না? 'কথামৃতে' সব আছে।"

প-বাবু—"মাস্টার মশায় কত কষ্টে এই 'কথামৃত' লিখেছেন। একদিন আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলুম, দেখি তিনি 'কথামৃত' লিখবার জন্য সেই নোট বুকখানা কাছে রেখেছেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বাহিরে গেলে, আমি একটু খুলে পড়লুম। কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারলুম না।"

মহাপুরুষজী—"তিনি খুব মেধাবী ছিলেন; ঠাকুরের কাছে যেতেন ও সব নোট করতেন। তিনি তাঁর নিজের জন্যই লিখেছিলেন; ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি

নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে ঐসব কথা ধ্যান করে করে পরে লিখেছেন। তাঁর প্রতিটি দিনের কথা সব মনে পড়ত, তারপর লিখতেন। তাই তো এত চমৎকার হয়েছে! এখন কত লোক শান্তি পাচ্ছে।"

ভক্ত—"শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ব্রজের লীলা খুব মেলে।"

এই কথা বলিয়া ভক্তটি একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। মহাপুরুষজী অতি মনোযোগের সহিত শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন।

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছ, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। আহা! গোপীদের কি ভাব! মান, সুখ, দুঃখ, লজ্জা বোধ নাই। গোপনে তাঁকে দেখবার জন্য পাগল, প্রেমে বাস্তবিকই মানুষের এই রকম অবস্থা হয়।"

অপর ভক্ত—"আচ্ছা, যীশুখ্রীষ্ট যেমন ত্যাগ প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর তেমন করেছিলেন কি?"

মহাপুরুষজী—"কি করে জানলে ঠাকুর করেন নাই? অবশ্য সকলকেই তিনি ত্যাগের কথা বলতেন না। কারণ তিনি জানতেন সকলের ভাগ্যে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। তিনি যখন আমাদের উপদেশ দিতেন, তখন অন্য লোক সামনে থাকত না। তুমি কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের সেই ক'জনের মধ্যেই মাত্র থাকবে? দেখছ না—এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব সাধু হতে আসছে। পেটের দায়ে তো এরা সাধু হয় না। University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) বড় বড় degree (উপাধি) পেয়েছে, সেইসব ত্যাগ করে আসছে। এ কি ঠাকুরের জন্য নয়? অবশ্য দেশশুদ্ধ লোক তো আর ত্যাগী হতে পারবে না। তবে তারা ঠাকুরের ত্যাগের mould (ছাঁচ)-কে ideal (আদর্শ) করে চলবে।

নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে এই সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এদেশের লোকের ideal (আদর্শ) হতেই হবে।"

সকলে নিস্তব্ধ। ঘর যেন শান্তির নিকেতন হইয়াছে। সকলেরই মন ত্যাগের প্রেরণায় অনুরণিত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের এক উচ্চস্তরে বিচরণ করিতেছে। কোন ভক্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন আর মহাপুরুষজীর কথাগুলি অনুধ্যান করিতেছেন—তাহাতেও বিমল আনন্দ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন জ-দাদা আসিয়া। তাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম; মিস্ ম্যাক্‌লাউড্ (স্বামীজীর শিষ্যা) বোম্বাই হইতে করিয়াছেন। মহাপুরুষজী উহা যত্নের সহিত পড়িয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "চলল এবার! জয় গুরু মহারাজ।" (মিস্ ম্যাক্‌লাউড্ আমেরিকা যাইতেছেন)।

জনৈক ভক্ত—"আচ্ছা মহারাজ, আমরা তো সংসারী লোক, আমরা জপ ধ্যান বেশী করতে পারি না, আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাব কি?"

মহাপুরুষজী—"তাঁর নাম আর তিনি কি পৃথক? নাম করলেই তো সব হয়ে যাবে; আবার কি? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে; আবার কি?"

এবার ন-বাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। তাঁহাকে মহাপুরুষজী বলিলেন, "ঠাকুরঘরে যাও, প্রসাদ নাও। আহা! 'ন', তুমি বেশ আছ। ঠাকুর তোমাকে কোন ঝঞ্ঝাটে রাখেন নাই, বেশ মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোনও ঝঞ্ঝাট নাই, কেন আর রয়েছ? এসে পড় না এইখানে। আমরা জানি তুমি বেশ মুক্ত আছ। আর কেন, তুমি এসে পড়।" কথাগুলি বেশ জোরের সহিত বলিলেন।

ন-বাবু—"হ্যাঁ, মহারাজ, এবার একটা বন্দোবস্ত করে এসে পড়ব। আপনার কৃপা।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসে পড়।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি মহারাজের জন্য একখানা কাপড়, একটি আম ও একটি খরমুজা আনিয়াছিলেন। তাহা মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, "আপনি এই গরীবের কাপড়খানা পরবেন।"

মহাপুরুষজী—"আবার কাপড় এনেছ কেন? কত কাপড় রয়েছে।"

মহারাজজী সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই কাপড়খানা বেশ পাতলা। কাল ছুপিয়ে দিও। গরমের দিনে বেশ হবে। ফলগুলি ঠাকুরঘরে দাও।"

মশা খুব জ্বালাতন করে। তাই শ-মহারাজ বেলা থাকিতেই মশারি টাঙাইতেছেন ও মশা তাড়াইতেছেন।

মহাপুরুষজী—"মশা বড় জ্বালাতন করে। দুই-একটা যদি মশারির ভিতর থেকে যায়, সারারাত্রি জ্বালাতন করে।"

ভক্ত—"মশা পায়ে বড় কামড়ায়।"

মহাপুরুষজী—"ওরা যে ভক্তলোক। তাই পায়ে কামড়ায়।" (সকলের হাস্য)

ভক্ত—"আচ্ছা, মহারাজ, মশা কেন ভগবান সৃষ্টি করলেন?"

মহাপুরুষজী—"তা কি করে বলব? এসব দুর্ব্বোধ্য। ভগবান কেন করলেন—এসবের উত্তর দেওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছা।"

একটি ভক্ত এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষজী—"আসুন, আপনার গলাটি সারুক। একদিন পদাবলী শুনতে হবে।"

ঐ ভক্ত—"হ্যাঁ, মহারাজ, আমি একদিন শুনাব।"

সন্ধ্যারতির আয়োজন হইতেছে। মহাপুরুষজী ঠাকুরের একটু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে নানা দেব-দেবীর নাম করিতে লাগিলেন। আমিও আরতি দর্শন করিবার জন্য প্রণাম করিয়া উঠিলাম।

মহাপুরুষজী—"এসো, তুমি কি এখনই যাবে?"

আমি—"না, মহারাজ, আরতির পরে যাব।"

আরতি দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে আবার আসিলাম।

মহাপুরুষজী—"তুমি এখন যাবে?"

আমি—"না, আমরা একসঙ্গে যাব।"

পরে কাশীধামের কথা উঠিল। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা যখন কাশীধামে ছিলুম, তখন গরম পড়লে খুব ক্ষুধা হত। কি আর করি, রান্নার সময় কয়েকখানি রুটি তৈরী করে রাখতুম। সন্ধ্যাবেলা তাই খেতুম। তখন সেখানকার আয় খুব কম। তাই ঐ ব্যবস্থা করতে হ'ত।"

চন্দ্র মহারাজের কথায় মহাপুরুষজী বলিলেন, "ও বড় চমৎকার লোক। এমন ভক্তি বিশ্বাস দুর্লভ। দেখ তো ঐ পঙ্গু শরীর। বসে বসেই পনর-ষোল জনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হয়। অতি চমৎকার লোক। বড়ই আশ্চর্য্য হই।"

ভক্ত—"মহারাজ, এবার যখন কাশীতে ছিলাম তখন তিনটি

রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তা আমরা যে মঠের ভক্ত তা জানতে দিই নাই—"তোমাদের এখানে চিকিৎসা কেমন হয়? সাধুরা কেমন যত্ন করেন?" তারা উত্তর করল, "বাবু, এমন চিকিৎসা কোথাও পাই নাই। সাধুরা বড়ই যত্ন করেন।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, সাধুরা তো আর হাসপাতালের মত সেবা করে না, প্রাণের টানে করে—নিজেদের চিত্তশুদ্ধির জন্য করে।"

ভক্ত—"শুনেছি, আপনাদের নাকি প্রথমে মাত্র চার আনা সম্বল ছিল।"

মহাপুরুষজী—"না হে, না—চার আনাও সম্বল ছিল না। তবে ঘটনাটা শোন। একদিন চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) আর একজন গঙ্গার ধারে বৈকালে বেড়াচ্ছিল। তারা দেখে—রাস্তায় একজন বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা পড়ে আছে। অন্তিমকাল উপস্থিত। একটু জল খেতে চাইছে। কিন্তু কারো ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় চারুই বোধ হয় ঐ রোগীর কাছে গিয়ে দেখে যে হাঁ করে জল চাইছে। চারু গিয়ে জল দেয় এবং দেখে যে কাপড়ও নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ভিক্ষে করে একখানা পুরানো কাপড় আনে। একটা মেয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। তাকে বলল, 'আপনার কলসীটা দেবেন? আমি একঘড়া জল এনে একে পরিষ্কার করে দেব।' স্ত্রীলোকটি দয়া করে নিজেই জল এনে দিল। ওরা রোগীকে পরিষ্কার করে কাপড় পরিয়ে বোধ হয় পরিচিত কারো বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেই সময় বাজারে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এই রোগীর কথা বলে কিছু ভিক্ষা চাইলে ঐ ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি সিকি দিলেন। তাই দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা হোলো। কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) ও

চারুবাবু ভিক্ষা করে প্রায় পনের দিন এইভাবে সাহায্য করল। রোগী আরোগ্যলাভ করল। এরপর থেকে ঘাটে মাঝে মাঝে এমন রোগী যাদের দেখতে পেত, তাদের সেবা যত্ন করত। এখন দেখ, এই আশ্রমে ১৫০টি বেডস্ (শয্যা) হয়েছে, তবু কুলায় না।"

এইবার আমরা ঘড়ি দেখিলাম, চৈত্র মাস হইলেও বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। দোলপূর্ণিমার পরের দিন বেশ চাঁদের আলো। আমরা উঠিব, এমন সময় মহাপুরুষজী আমাকে বলিলেন, "তুমি আলোয়ান আনো নাই ?"

আমি—"না মহারাজ, গতকাল সব গরম জামা তুলে রেখেছি। চৈত্র মাসে গরম কাপড় লাগবে মনে হয় নাই। শনিবার হলেই ছট্‌ফটানি হয়।"

মহাপুরুষজী—"দেখ, ছট্‌ফটানিই আসল জিনিস। এইটি যেন থাকে।"

এবার আমরা প্রণাম করিয়া চাঁদের আলোয় নয়টার সময় রওনা হইলাম।

* * *

২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৭, শনিবার। বেলুড় মঠ। অফিসের পর যথা-রীতি মঠে পৌঁছিলাম। বরিশালবাসী জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে মঠ দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোক দ্বি-মহারাজের পরিচিত। রেঙ্গুনে কাজ করেন। ছুটিতে কালীঘাটে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মঠ দেখাইলাম—ঠাকুরঘর, স্বামীজীর মন্দির ইত্যাদি। তাঁহারা মহাপুরুষজীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রণামান্তে অল্পক্ষণ পরেই ফিরিবেন বলিয়া উঠিলেন। পূজনীয় মহাপুরুষজীর

শরীর সেদিন তত ভাল ছিল না। তিনি স্নান ও আহার করেন নাই। পূর্ব্বদিকের উপরের বারাণ্ডায় আরাম কেদারায় উপবিষ্ট আছেন। ক্রমে প্র-বাবু, ম-বাবু, প-বাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী এবার গুড্-ফ্রাইডের ছুটি কবে ও কয় দিন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, এই গুড্-ফ্রাইডে নিয়ে একবার খুব রগড় হয়। স্বামীজী বুড়োবাবাকে বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেখ বুড়োবাবা, এবার গুডফ্রাইডেটা বুধবারে পড়েছে।' বুড়োবাবা বল্লেন, 'হ্যাঁ'। স্বামীজীর কথায় তাঁর এমনি বিশ্বাস ছিল যে, দ্বিরুক্তি না করে একথা মেনে নিলেন। স্বামীজী এ নিয়ে বেশ হাসি-তামাসা করতেন। এখনও এমন সব সরল লোক আছেন কিন্তু, যাঁদের এরকম বললেও বিশ্বাস করেন।" অতঃপর মহাপুরুষজী প্র-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কুম্ভে তোমার মা যাবেন কি? এবার বড় যোগ, বহু লোকসমাগম হবে। শুনছি গবর্ণমেণ্ট এবার ভাল বন্দোবস্ত করেছেন। কুম্ভস্নান হবে ৩০শে চৈত্র। মঠ থেকেও অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ), কৃষ্ণলাল (স্বামী ধীরানন্দ) এরা সব যাবে।" পরে আবার বলিলেন, "কুম্ভস্নান মানে হচ্ছে বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে যেদিন সঙ্গম হয়, সেদিনই হচ্ছে স্নান।* ধন্য মা গঙ্গা! তোমার এত মাহাত্ম্য! ধন্য তুমি। কত লাখ লাখ লোক স্নান করবে সেদিন।"

---

* পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশৌ গতে গুরৌ গঙ্গাদ্বারে ভবেদ্ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমম্—স্কন্দপুরাণ। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য্য মেষরাশিতে অবস্থান করিলে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

ধারচুলা আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসী পীড়িত হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ জনৈক ব্রহ্মচারী মহারাজজীকে দিলেন।

মহাপুরুষজী—"কতরকম ব্যাধি আছে, কে জানে বাবা কি হবে?"

ব্রহ্মচারী—"এত অসুখ তবু ঠাকুরকে ভোলেন নাই। বড় ভক্তি-বিশ্বাস।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, ও বড় ভাল লোক। আমি জানি তার খুব ভক্তি বিশ্বাস। তা এই দেহ তো যাবেই। আসল কথা হচ্ছে যেন তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস থাকে। মৃত্যু তো হবেই, সে রাজাই হোক, কি ভিখারীই হোক। ভক্তি-বিশ্বাস যদি থাকে তবেই মঙ্গল। এই ভক্তি-বিশ্বাস থাকলেই ধন্য।"

এমন সময়ে কবিরাজ উপস্থিত হইলেন।

কবিরাজ—"মহারাজ, শুনলাম আপনার নাকি শরীর খারাপ? আজ কিছুই খান নাই।"

মহাপুরুষজী—"শরীরের ধর্ম্মই এই—কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। শরীর থাকলেই রোগ শোক থাকবেই। তবে আত্মার কিন্তু কোন অসুখ নাই। আমি তাই ভালই আছি, আমার তো কোন অসুখ নেই।"

কবিরাজ—"আপনারাই ঐসব বোঝেন। আমরা আর কি জানি?"

৬টা বাজিল। অধিকাংশ ভক্ত উঠিয়া গেলেন। তখন ঘরে আমি আর প-বাবু। মহাপুরুষজীর অসুখ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। আমি তাঁহার পদ-সেবায় নিরত। প-বাবু আস্তে আস্তে তাঁর মাথায়

হাত বুলাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পর আরতি দেখিয়া মহাপুরুষজীর বিদেহ অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম।

* * *

১৭ই এপ্রিল, ১৯২৭, বেলুড় মঠ। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সভায় যোগ দিবার জন্য প্রায় সাড়ে চারিটার সময় মঠে পৌঁছিলাম। মঠের নীচের হলঘরে সভা বসিয়াছে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, সুধীর মহারাজ প্রমুখ মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত আছেন, সভা আরম্ভ হইল। মিশনের কার্য্যবিবরণী ও হিসাবপত্র পঠিত হইল। অবশেষে প্রায় ৬টার সময় সভাভঙ্গ হইলে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। মহাপুরুষজী মঠের পশ্চিম দিকের উঠানে দাঁড়াইয়া ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন, আমিও প্রণাম করিয়া নিকটেই দাঁড়াইলাম। ভবানীপুরের সু-বাবু প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুদের কেহ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া থাকেন কি না।

মহাপুরুষজী—"না হে, না। আমরা ও-সবের মধ্যে থাকব না। এই 'ন-' রয়েছে, তাতেই কত কি কথা উঠেছে।"

সু-বাবু চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইল। মহাপুরুষজী তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলেন। ঘর অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারেই প্রণাম করিতে মহাপুরুষজী চিনিতে পারিলেন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি—"মহারাজ, আপনার শরীর এখন কেমন? এবার তো খুব ভুগলেন।"

মহাপুরুষজী—"কি আর ভুগলুম?"

আমি (অবাক হইয়া)—"কেন, এই যে বাত, সর্দ্দি ইত্যাদি ?"

মহাপুরুষজী—"কি ? ও কিছুই না" (খুব জোরের সহিত বলিলেন)।

আমি তো শুনিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আমার বিস্ময়-ভাব দেখিয়া তিনি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিলেন। এই সামান্ত ছুটি কথার মধ্যে কত অর্থ রহিয়াছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। এইরূপ অসুখ, এইরূপ কষ্ট ! তথাপি যেন কিছুই হয় নাই। কাহার কষ্ট, কেবা ভোগ করে ? শুনিয়াছি ব্রহ্মোপলব্ধি হইলে শরীর আর আত্মা পৃথক জ্ঞান হয়। তবে কি ইহা ব্রহ্মোপলব্ধি ? নীরব বিস্ময়ে ঐ কথা ভাবিতেছিলাম। আমার বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব ভাঙ্গিল মহারাজজীর কথায়। মহাপুরুষজী বলিলেন, "তবে এস।" ষ্টীমারের সময় হইয়াছে। প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

* * *

১লা মে, ১৯২৭, রবিবার। বেলুড় মঠ। স্থ-বাবু, ন-বাবু আর আমি একত্রে বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। পূজনীয় কেদারবাবার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরে মহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরের দিকে চলিলাম। তিনি তখন খোকা মহারাজের ঘরে ছিলেন। জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "Known and knowable (জ্ঞাত ও জ্ঞেয়) যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানেই আমাদের ঋষিরা আরম্ভ করেছেন। West (পাশ্চাত্ত্যদেশ) কিন্তু known and knowable (জ্ঞাত ও জ্ঞেয়) পর্য্যন্ত এসে থেমেছে। তারপর আর কি আছে তারা জানতে চায় না। God (ঈশ্বর) সম্বন্ধে ঐ পর্য্যন্ত ধারণা। স্বামীজী ঐকথা বলতেন। এখন কিন্তু ওরা বুঝতে

চেষ্টা করছে যে ঐখানেই শেষ নয়। আরও আছে। ওরা materialist (জড়বাদী)। এত materialist (জড়বাদী) বলেই শান্তি পাচ্ছে না।"

ইহার পরে মহাপুরুষজী কোন কারণে বাহিরে গেলেন। পথে একটি ছেলে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি যেন বলিতেছিলেন। তাঁহার দু'একটি কথা আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। কথাগুলি অমৃতমাখা।

মহাপুরুষজী—"তোমাদের খুব ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম হোক। তোমাদের হতেই হবে।"

তিনি ফিরিয়া আসিলে অল্পই কথা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

* * *

৮ই মে, ১৯২৭, রবিবার। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষজীর ঘরে ৪টার সময় আমি ও সু-বাবু উপস্থিত হইলাম। জনৈক ভদ্রলোক কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সম্বন্ধে কথা তুলিলেন।

মহাপুরুষজী—"এও ভগবানের ইচ্ছা। মঙ্গলের জন্য হচ্ছে। হিন্দুরা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এতে মঙ্গলই হবে।"

ভবানীপুরের প্র-বাবুর ছেলের বয়স মাত্র ৪ বৎসর। এই বয়সেই সে বাজনাতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ন-বাবু বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। তা না হলে এত অল্প বয়সে এরকম হওয়া অসম্ভব।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে। অসম্ভব কি?"

এমন সময় কয়েকটি স্ত্রী-ভক্ত আসিলেন। তাঁহাদের একজন খোকা

মহারাজের শিষ্যা। তাঁহাদের এই প্রথম দর্শন। মহাপুরুষজী তাঁহাদের সহিত এমন অমায়িক ব্যবহার করিলেন যে, মনে হইল তাঁহারা যেন কতকালের আত্মীয়া। এমন প্রাণঢালা ভালবাসা ঠাকুরের প্রতি ও ভক্তের প্রতি! পূজনীয় খোকা মহারাজ সেদিন মঠে ছিলেন না বলিয়া ভক্তটি প্রথম একটু মনক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মহাপুরুষজীর এরূপ অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সে ভাব কাটিয়া গেল এবং মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিলেন Miss Cook (কুমারী কুক)। তিনি পূজনীয় শরৎ মহারাজের শিষ্যা। মহাপুরুষজী বলিলেন, "অদ্য Mrs. Bentdley (শ্রীযুক্তা বেণ্টডলী) এসেছিলেন। বড় ভাল লোক। তিনি এদেশে মেয়েদের প্রসূতি-আগার সম্বন্ধে কিছু লিখবেন। তাই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। তিনি ভারতীয় নারীদের জন্য প্রকৃতই দরদ অনুভব করেন।" কথাগুলি ইংরেজীতে হইল। আমরা পরে প্রণাম করিয়া ৭-৩০ মিঃ-এর ষ্টীমারে বাসায় ফিরিলাম।

* * *

২২শে মে, ১৯২৭, রবিবার। বেলুড় মঠ। যথারীতি মঠে পৌঁছিলাম। বেলা তখন ৪টা। মহাপুরুষজীর ঘরে অনেক ভক্তই উপস্থিত। নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবিদেশের কথা। হাসি, তামাসা, আবার পারিবারিক কথা—সবটাতেই তাঁহার সমান আনন্দ। মহাপুরুষজী একটি ভক্তকে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমাদেরও তোমাদের মত anxiety (উদ্বেগ) আছে। তবে সেটা কেমন জান?

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন দেখেছি। তাঁদের সমাধি-অবস্থা দেখেছি। সেই সব দেখে ও নিজেদেরও অনুভূতি থেকে এখন ঠিক ধারণা হয়ে গেছে যে, এমন একটা অবস্থা আছে যেখানে কোন উদ্বেগ নাই। সেখানে সৃষ্টিই নাই, (সেটা) সৃষ্টির বাহিরে। সেখানে আর কিছুই নাই, আছে কেবল শান্তি। এই যে সৃষ্টি দেখছ এটিও বাইরের। সেখানে কিছুই নাই। তাই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলে আমাদের আর কোন ভাবনা থাকে না। তবে সাধারণ অবস্থায় এই মিশন সম্বন্ধে ভাবনা কোন কোন সময় হয়। দিন দিন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। নানাপ্রকার জটিল কাজ আসছে। হয়তো বা কারুর অসুখ, বাঁচবার আশা নেই। এই সব আর কি।"

সেদিন আমার শরীর ভাল ছিল না। তথাপি মহাপুরুষজীর এমন স্নেহময় আকর্ষণ যে, তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে না যাইয়া থাকিতে পারি নাই। আমি কিছু না বলিলেও তিনি কিন্তু নিজে হইতেই আমার শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিষয় জানিয়া লইলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম—এমন উত্তম আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সমাধিবান মহাপুরুষ, কিন্তু ভক্তদের প্রতি তাঁহার কী অপরিসীম করুণা যে আমার এই সামান্য অসুস্থ অবস্থাটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না!

আমরা সেদিন ৬-৫ মিঃ-এর ষ্টীমারে কলিকাতায় ফিরিলাম।

* * *

৩রা জুন, ১৯২৭। অফিসের ছুটির পর মঠে পৌঁছিলাম। মহাপুরুষজী মঠবাড়ীর পূর্ব্বদিকের নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া

আছেন। নিকটেই ছেলেরা কসরৎ করিতেছিল। তাহাই দেখিতেছিলেন। আমি ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। তিনি তখন বেঞ্চে উপবিষ্ট। শ্রীচরণের কুশল জিজ্ঞাসা করায় মহাপুরুষজী উত্তরে বলিলেন, "ভাল আছি।"

ভক্ত—"এই গরমে কষ্ট হয় নাই ?"

মহাপুরুষজী—"না, গরমেই থাকি ভাল। শ্লেষ্মার ধাত কিনা, গরমে কম থাকে।"

রা-মহারাজ আসিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা হইল। কথার মাঝে মহাপুরুষজী বলিলেন, "জামরুল পেটের পক্ষে বড় উপকারী। তুমি খেও চার-পাঁচটি করে। বেশ পেটের উপকারী।"

মহাপুরুষজী প্র-মহারাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে তাহাকে বলিলেন, "দেখ, উপর থেকে সন্দেশ নিয়ে এস, সরায় আছে। দেখো ষোল-সতর জনের এক একটা হয় কিনা। এই সব ছেলেদের দিতে হবে।" ছেলেরা তখনও নানারকম কসরৎ করিতেছিল। তাহারা ভবানীপুর হইতে আসিয়াছে। প্র-মহারাজ সন্দেশ লইয়া আসিলেন। সকলকে একটি একটি সন্দেশ দেওয়া হইল। মহাপুরুষজী উক্ত সন্ন্যাসীকে ছেলেদের খাবার জল দিতে বলিলেন।

যে সব ছেলে কুস্তি করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন খুব পেশী-সঞ্চালন দেখাইয়াছিল। তাহাকে দেখাইয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "ঐ ছেলেটি বেশ শিখেছে, বেশ উন্নতি করেছে। ছেলেটি নাকি খুব রোগা ছিল, এখন বেশ শরীর হয়েছে। যদি ব্রহ্মচর্য্য

থাকে তবেই এসব থাকবে। তা না হলে দুদিন পরেই সব যাবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে কিছুই হবার জো নাই। যে কোন বিষয়ে এই secret of success (সাফল্যলাভের কৌশল)। এখন ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য না থাকার দরুন নানা রকম সব ঘটছে।”

মহাপুরুষজী উপরে উঠিতে যাইতেছেন। এমন সময় স্থ-বাবু দুইজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন মঠের Industrial School (শিল্প বিদ্যালয়) দেখিবেন বলিয়া। মহাপুরুষজী খুব খুশী হইলেন। সু-মহারাজকে ডাকিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের প্রসাদ দিতে ও বিদ্যালয় দেখাইতে বলিলেন। তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, “দেখ, তোমার বাবার কথা আমরা সব সময়েই মনে করি। তিনিই এই মঠে কলের জলের জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এজন্য আমরা বড়ই grateful (কৃতজ্ঞ)। তাঁর দয়াতেই আমরা জল খাচ্ছি। দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব এ জগতে সকলকেই নিতে হবে। স্বামীজী এসেছিলেন এই সাম্যভাব দেবার জন্য। এইভাব ইউরোপ পর্য্যন্ত কালে যাবে। তাঁর এই ভাব দু-চার বৎসরে নষ্ট হয়ে যাবে না। পাঁচ-সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত চলবে। এখন তো মাত্র শুরু হয়েছে। এমন উদারভাব সকলকেই নিতে হবে এবং লোকেও শান্তি পাবে। যে যেখানেই এখন প্রচার করুক, তাঁর ভাবই প্রচার করছে। কিন্তু আস্তে আস্তে কাজ হয়ে যাচ্ছে ও হবে। এই মাত্র শুরু। স্বামীজীর বা ঠাকুরের নাম তারা নাই বা করলে, তাতে কিছু আসে যায় না, ঠাকুর মান চান নি। তিনি তা অতি তুচ্ছ মনে

করতেন। দেখ, নাম ও মান হজম করা অতি শক্ত ব্যাপার। যারা আত্মসাক্ষাৎকার করে নি, তারা কিছুতেই নাম ও মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারে না। দেখনা—এখন কত অবতার বেরুচ্ছে। হয়ত একটি লোক ধর্ম্মপথে একটু advanced (অগ্রসর) হল, তার হয়ত চার-পাঁচ শত চেলা বনে গেল। তারপর সাধু এই মান পেয়ে একেবারে ফুলে উঠলেন এবং সব শেষ হয়ে গেল। ঠাকুর ও স্বামীজী এই দলের লোক ছিলেন না। তাঁদের ভাব আর কি বলব! দেখছি কালে তাঁর এই সমন্বয়বাদ সারা জগতকে নিতে হবে।" এমন সময় শৈ-বাবু আমাকে ডাকায় অন্যত্র যাইতে হইল। পরে আসিয়া শুনিলাম মহাপুরুষজী বলিতেছেন, "সুভাষবাবু বেঁচে উঠুন। ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন।"

* * *

১১ই জুন, ১৯২৭, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। প্রণামান্তে মহাপুরুষজীর নিকট বসিয়া আছি।

মহাপুরুষজী—"অ-, কেমন আছ?"

অ- —"একটু ভাল আছি।"

মহাপুরুষজী—"তোমার চেহারা কিন্তু সারে নাই।"

এমন সময় শৈ-বাবু আসিলেন একতাড়া কাগজ লইয়া মহাপুরুষজীর সহি করাইতে। শৈ-বাবু বলিলেন, তাঁহার এক বন্ধু খেদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমরা মহাপুরুষজীর কিছুই সেবা করিতে পারিলাম না, এমন কি একটি পয়সাও দিতে পারি না, ইত্যাদি।" ইহা শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "তাকে লিখে দিও যে আর আমার কি সেবা করবে? ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের

কিছুরই অভাব নাই। সে যেন ঠাকুরকে একটু একটু ডাকে—তবেই আমি খুশী হব, আর কিছুই চাহি না।” এই কথাগুলি এমন করুণার সহিত বলিলেন যে, আমাদের মত কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। একটি স্ত্রীভক্ত উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম তাঁহার নাকি ভাবসমাধি হয়। ভক্তটির সহিত দেখা করিবার জন্য মহাপুরুষ মহারাজ পাশের ঘরে গেলেন ও তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিলেন। দুই-একটি কথা আমাদের কানে আসিতে লাগিল। শুনিতে পাইলাম তিনি ভক্তটিকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, “তোমার মঙ্গল হবেই।”

* * *

১৮ই জুন, ১৯২৭, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। অদ্য বৈকাল ৫টার সময় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিলাম। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্র-বাবু জানাইলেন, গদাধর আশ্রমস্থ বেদ বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি খুব সুখী হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে যোগেশবাবুর সংবাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, তিনি আসেন, এখন ভাল আছেন। গত বৎসর খুব ভুগেছেন। তৎপরে অনাদি মহারাজের (স্বামী নির্ব্বেদানন্দের) সহিত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে মহারাজজী কিছু আলাপ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ব্রহ্মচারী উপস্থিত হইলেন। তিনি কাশী সেবাশ্রমে থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার মায়ের অসুখের খবর পাইয়া বজবজে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আবার কাশী যাইবেন; কিন্তু হাতে পয়সা নাই। মহাপুরুষজী সমস্ত খবর শুনিলেন।

মহাপুরুষজী—"তোমার সঙ্গে কত আছে ?"

ব্রহ্মচারী—"২৸৶০ ।"

মহাপুরুষজী—"তা বেশতো, ঐ নিয়েই যাওনা। হেঁটেই না হয় গেলে। কত লোক তো যায়। ভয় কি ? সাধুদের ঐভাবেই যেতে হয়, তবে তো বুঝি বৈরাগ্য। আমরাও এক সময়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে সব বেড়িয়েছি। এখনও আমাদের অনেকে এইভাবেই যায়।"

প্রিয় মহারাজ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ)কে ব্রহ্মচারীটির সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তখন একপ্রকার ঠিক হইল যে আপাততঃ সে সালকিয়া থাকিবে। তখন সন্ধ্যা হয়, হয়। আমি একটু এদিক ওদিক বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর আরতিদর্শন করিয়া ও একটু রামনাম শুনিয়া আবার মহাপুরুষজীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন মঠপ্রাঙ্গণে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমি প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "অমূল্য, তুমি বাসে যাবে ?" আমি বলিলাম "হ্যাঁ, মহারাজ।" রামনাম তখনও হইতেছিল, মধুর রামনাম শুনিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত একটু গম্ভীর ও আত্মস্থ। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া আছি।

আমি—"মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) 'রামনাম' এদেশে প্রবর্ত্তন করে কতই না আনন্দ দিয়েছেন। এমন মধুর পবিত্র ভাব !"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, বড়ই পবিত্র। এখন সারা বাংলাদেশেই রামনাম হচ্ছে ও শুনে কত লোক শান্তি পাচ্ছে।"

আমি—"মহারাজ, এখন দেশ যতই শিক্ষিত হচ্ছে, ততই লোক ঠাকুর স্বামীজীর ভাব নিচ্ছে। শিক্ষিত লোক ভিন্ন ঠাকুর স্বামীজীর ভাব নেওয়া কঠিন।"

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছ, অন্য লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কি করে এমন উদার সরল ভাব নেবে?"

আমি—"মহারাজ, এখনও আমাদের দেশে যারা রক্ষণশীল তারা ঠাকুরের ভাব নিতে চায় না। তারা কেবল জাত নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে একজন লোক বলেছিল, 'রামকৃষ্ণ মিশনে জাতের বিচার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের জাত নষ্ট করা ভাব ছিল না, কিন্তু স্বামীজী এই এক নূতন ঢং করে সকলের জাত নষ্ট করলেন।' আমি তাকে জবাব দিলুম, 'মশাই, স্বামীজী কি করে সকলের জাত নষ্ট করলেন? আপনি বুঝি আমাদের উৎসব দেখে এই দোষারোপ করছেন? কই, আমাদের মঠের সাধুরা তো কখনও কাউকে বলেন না যে, তোমরা সকলে একত্রে বসে খাও। যাঁরা খাচ্ছেন তাঁরা ইচ্ছা করেই একত্রে বসে প্রসাদ নিয়ে ধন্য হচ্ছেন। যদি কেউ পৃথক খেতে চান, তারও ব্যবস্থা আছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে তো সকল জাত একসঙ্গে বসে খায়। আর জাত স্বামীজী কি করে নিলেন? আমি তো কলকাতায় দেখেছি বড় বড় নিমন্ত্রণে ছাদে সকল জাত, এমন কি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত, এক সঙ্গে বসে খান, কোন আপত্তি নেই।"

মহাপুরুষজী—"ঐ দেখ কি বুদ্ধি! এখানে ইচ্ছা করে উৎসবে প্রসাদ নেয়। আর ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে রান্না করান হয় এবং ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐ সব লোক ইচ্ছা করে প্রসাদ নেয়। আমরা কাউকেই কখন বলি না যে তোমরা একত্রে বসে খাও। এখনও দেশে এই ভাব রয়েছে। জাত তোমাদের আছে কোথায়? বার বৎসর ম্লেচ্ছদের চাকরি করলে তো ম্লেচ্ছ হয়ে

যায়। তোমরা তো বার বৎসর কেন, ঢের ঢের বার বৎসর ম্লেচ্ছের চাকরি কচ্ছ। তোমাদের জাত আছে কি? কিছুই করবে না, কেবল জাত নিয়ে মারামারি। তাদের ধর্ম্ম ঐ জাত পর্য্যন্ত, ব্যস্। গঙ্গা গঙ্গা কচ্ছে, গঙ্গার স্তব পড়ছে খুব। কিন্তু গঙ্গাজল পান ও স্পর্শ করেও মনের খুঁত যাচ্ছে না। Realization (অনুভূতি) নাই।"

আমি—"এখন ত দেখছি, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল।"

মহাপুরুষজী—"তা আবার বলতে! জগতের শান্তি এখান হতেই হবে।"

ইহার পর গদাধর আশ্রমের কথা উঠিল, মহাপুরুষজী বলিলেন, "ঐ যে ছোট ছোট ছেলেরা রোজ আসছে, এ বড় আনন্দের কথা। এদের এখন হতেই impression (ছাপ) পড়লে, কালে এরাই ঠিক ঠিক গড়ে উঠবে। তোমরা খুব ভাগ্যবান। তোমরা ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব পেয়েছো। তোমাদের উন্নতি হবেই।"

* * *

১০ই জুলাই, ১৯২৭, রবিবার। বৈকাল প্রায় সাড়ে চারটা। বাসে করিয়া মঠে পৌঁছিলাম। মহাপুরুষজী একা ঘরে বসিয়া আছেন, প্র-মহারাজকে ডাকিতেছেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে পাশের ঘরে যাইতেছি দেখিতে পাইয়া মহাপুরুষজী আমাকে ডাকিলেন। আমিও "যাচ্ছি, মহারাজ" বলিয়া সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিলাম এবং প্র-মহারাজকে ডাকিয়া দিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"না, থাক। আসবে এখন।" আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম, তিনি আমার অসুখের খবর অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন

এবং কবিরাজী চিকিৎসায় ফল হইল না দেখিয়া বলিলেন, "এবার তুমি সুরেশ ডাক্তারকে দেখাও।" আমি তাঁহাকে একটু হাওয়া করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজন মহিলাভক্ত কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি; তিনি ইসারায় জানাইলেন, "দরকার নেই"। মহিলা-ভক্তগণ একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পরে আসিলেন বরিশালের কতিপয় স্ত্রী-ভক্ত জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে। তাঁহারা প্রণামান্তে ঘরে বসিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মহাপুরুষজীকে বলিলেন, "মহাপুরুষজী, আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন।" আমি তখনও দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছি।

মহাপুরুষজী (ভাবস্থ হইয়া)—"দেখ, উপদেশ আর কি দেব। আমাদের এক উপদেশ—তাঁকে যেন ভুল না হয়। এই হচ্ছে আসল উপদেশ। সংসারে তোমরা রয়েছ, থাক। কিন্তু তাঁকে যেন ভুলো না। সংসারে সব কাজ করবে, কিন্তু দিনান্তে অন্ততঃ একবার একান্তে তাঁর নাম করবে। এটি যেন বাদ না যায়। এটি ভুল হলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। আর যদি তাঁকে স্মরণ কর, তবে সুখে দুঃখে বিচলিত হবে না। তাঁকে সর্ব্বদাই স্মরণ-মনন করবে। কখনও বা জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, আলোচনা—এসব সর্ব্বদা করবে, তবে ঠিক তাঁকে মনে থাকবে। সকল কাজেরই যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং প্রয়োজনীয়তা আছে, ভগবানকেও ঐ রকম ডাকবার প্রয়োজন আছে। যখন যে অবস্থায় সময় পাবে, তখনই ডাকবে। তাঁকে প্রাণের সহিত ডাকবে। ডাকলেই তিনি সকল রাস্তা খুলে দিবেন। দেখ, তাঁকে ডাকতে যেন ভুল না হয়।"

স্ত্রী-ভক্ত—"কেন আমরা তাঁকে ভুলি ?"

মহাপুরুষজী—"কেন ভুলে থাক ? এ-ই মায়া। মায়াতে আছ, তাই তাঁকে ভুলে থাক, তাই মন ভগবানে যায় না, বিষয়ে মন টানে।"

স্ত্রী-ভক্ত—"কেন তিনি আমাদের মায়াতে রাখেন, কেন তাঁর দিকে মন যায় না ?"

মহাপুরুষজী—"বিষয়ে তোমাদের ভালবাসা রয়েছে, তাই তোমরা মায়াতে আটকে আছ। বিষয় যেমন ভালবাস, ভগবানকে কি তেমন ভালবাস ? তাই সংসারে বিচারের খুব দরকার। সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে আর কারো বলে দিতে হবে না। রোজই তো দেখছ—কত সংসারে জন্মালো, আবার দুদিন পরেই মরে গেল। এই সুখ, আবার দুদিন পরেই দুঃখ। এসব বিচার করলে তখন সংসারের অনিত্যতা বোধ হবে ও নিত্যবস্তু ভগবানকে মনে পড়বে। তখন মনে হবে—আমি কি করছি ? সব তো এখানেই পড়ে থাকবে, তবে কেন এত 'আমি' 'আমার' করছি। এরূপ যদি বিচার কর, তবে দেখবে ক্রমশঃ সংসারের উপর ঘেন্না জন্মাবে এবং ঈশ্বরের দিকে মন যাবে।"

স্ত্রী-ভক্ত—"এই 'আমি' 'আমার'ই যত গোল করে। আমরা কেবল 'আমি' 'আমার'ই দিনরাত করছি।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, 'আমি'ই যত গোল বাধায়। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক বিবেক আসে, তখন আর 'আমি' 'আমার' এসবে মন থাকে না। তখন 'তুমি' 'তোমার' হয়ে যায়।"

স্ত্রী-ভক্ত—"আচ্ছা, মহারাজ, মন কি ? আর এই মনটাই তো যত অনিষ্টের মূল। একে কিছুতেই বশ করা যায় না ?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, মনের উপরে বুদ্ধি, জ্ঞান, আত্মা সব আছেন। কিন্তু মনকে বাদ দিয়ে তুমি তথায় যেতে পারবে না। তাই মনকে বশে আনতে হবে। গীতায় আছে—অভ্যাসযোগ। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা মনকে বশে আনতে হবে। তবে তো তাঁকে পাওয়া যাবে। মন যদি বশে না আসে, ভগবানকে ডাকবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—যাতে মন বশে আসে। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। তাঁকে ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন অসুবিধা তখন থাকবে না।"

স্ত্রী-ভক্ত—"ভগবানের কৃপা ভিন্ন, আপনাদের দয়া ভিন্ন কিছু হবার জো নেই। আপনারা দয়া করুন, যাতে আমরা সংসার-সাগর পার হয়ে যাই।"

মহাপুরুষজী—"আমাদের দয়াই তো আছে—আর তো কিছু নেই, মা। তোমরা ঠিক সংসার-সাগর পার হয়ে যাবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমরা ঠিক সংসার-সাগর পার হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই।"

স্ত্রী-ভক্ত—"আমরা এই চাই, মহারাজ। আপনাদের দয়াতে যেন সংসার-সাগর পার হয়ে যাই।"

মহাপুরুষজী—"নিশ্চয়ই যাবে। তোমরা সংসার-সাগর পার হয়ে যাবে।"

স্ত্রী-ভক্ত—"আমি যদি আপনাকে চিঠি লিখি তবে উত্তর পাব ?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, পাবে বই কি। বরিশাল থেকে এসেছিলে, এই কথা লিখো, তবেই মনে পড়বে। তোমাদের বাসা কি বরিশাল শহরেই ?"

স্ত্রী-ভক্ত—"হ্যাঁ, মহারাজ, বরিশাল মিশনের কাছেই। কল্যাণানন্দ স্বামী আমার বোনের ছেলে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, একজন সাহেব ভক্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। তিনিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* * *

২৪ জুলাই, ১৯২৭, রবিবার। বেলুড় মঠ। খুব ভোরেই মঠে গিয়া কেদারবাবাকে প্রণাম করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখন উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, কু-বাবু ও ন-বাবু। প্রণাম করিয়া বসিতেই পূজনীয় মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমূল্য, ভাল আছ তো?" উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, আগের চেয়ে একটু ভাল"। কৃষ্ণলাল মহারাজের সহিত তিনি কথা বলিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন, "বিপিনবাবুর (ডাক্তার) ছেলের বিয়ে।"

মহাপুরুষজী—"বেশ, কয়েক দিন আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করবে —আনন্দ করবে ; কিন্তু স্থায়ী নয়। দেখ, কৃষ্ণলাল, আমি বুদ্ধদেবের কথা পড়েছিলুম, তাতে দেখলুম তাঁর সব গৃহস্থ ভক্ত ছিল। তারা কিভাবে গৃহস্থ-জীবন যাপন করবে, তিনি তার অতি চমৎকার উপদেশ দিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে এমন idea (ভাব) তাঁর ছিল না। গৃহস্থ হবে, কত সংযম করবে, শুদ্ধভাবে জীবন-যাপন করবে—এরূপ ভাল ভাল সব উপদেশ দিয়েছেন।

আর এখন দেখ, বিবাহ আমাদের দেশে কি হয়ে দাঁড়িয়েছে! কোথাও সংযমের ভাব নেই, অতি নীচ ভাব সব এসে গেছে।"

কু-বাবু—"সব এখন বিলাসিতায় মত্ত। দেখুন না, কলিকাতার অবস্থা।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কি বিলাসিতাতেই সব ডুবে রয়েছে! কি অবস্থাই না দাঁড়িয়েছে! কলিকাতার life (জীবন) miserable life (দুঃখের জীবন)। এমন কি, পাশের বাড়ীর লোককে চেনে না। এমন কিন্তু পূর্ব্বে ছিল না। এই তো আমরা সব আগে দেখেছি ন-বাবুর মাকে। তিনি প্রত্যহ সকালে উঠে তাদের পাড়ায় বাড়ী বাড়ী যেতেন, খবর নিতেন—কার কি খাবার আছে, কার কি অসুখ করলে, অসুখ দেখলে সেবা করতেন। আমাদের ন-বাবুরও সেই অভ্যাস ছিল। গিরিশ বাবুরও এই অভ্যাস ছিল। তিনি আপদে বিপদে লোককে সাহায্য করতেন। তিনি আবার ভাল হোমিওপ্যাথি জানতেন, লোককে ওষুধ দিতেন। পল্লীগ্রামে কিন্তু এখনও সেভাব আছে। অবশ্য এখন আগের চেয়ে কমে গেছে। পল্লীগ্রামে লোকের সঙ্গে রীতিমত সম্বন্ধ পাতান ছিল। আর এখন দেখ কি অবস্থা!"

অতঃপর মহাপুরুষজী একটি সিগারেটের case (বাক্স) বাহির করিলেন এবং দেখাইলেন। বিলাত হইতে কোন ভক্ত (প্র-বাবু) তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া ক-বাবু ও ন-বাবুকে একটি একটি দিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "তোমরা খেয়ে দেখ। ছোকরা অনেক টাকা খরচ করে পাঠিয়েছে। সে ব্যারিষ্টার (Bar-at-law) হয়ে আসছে, আজই তার কলকাতা পৌঁছবার কথা।"

এবার তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন। আমরাও চলিয়া আসিলাম। বৈকালে আবার মহাপুরুষজীকে দর্শন করিলাম। ললিত মহারাজের সঙ্গে তখন বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। রা-বাবু উপস্থিত ছিলেন, তাহার সহিতও কথা হইল। মহাপুরুষজী ললিত মহারাজকে যোগেশবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময়ে প্রাতঃকালে যে ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ ঘরে ঢুকিলেন। প্র-বাবু পূজনীয় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাপুরুষজী—"আজই এলে? তুমি কেন আজ এত bad weatherএ (খারাপ আবহাওয়ায়) বেরুলে? আজই এসে সব পোশাক ছেড়ে দিয়ে ভাল কর নাই। আজ weather (আবহাওয়া) বড় খারাপ। তুমি খালি গায়ে খালি ধুতি পরেছো—তোমার এ সব সহ্য হবে কেন? বাড়ী যাও। শীঘ্র গিয়ে কিছু গরম জামা পর। হঠাৎ তোমার সহ্য হবে কেন? এখন কয়েক দিন এরকম যাক—তা না হলে অসুখ হয়ে পড়বে। খালি পা, মোজা নেই। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে next steamer (পরবর্ত্তী ষ্টীমারে) বাড়ী চলে যাও। দেরি কোরো না। তা না হলে অসুখ করবে।"

প্র-বাবু ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরপ্রণামান্তে মহারাজকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

* * *

৬ই আগস্ট, ১৯২৭, শনিবার। অদ্য আমি ও সু-বাবু একসঙ্গে মঠে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রণাম করিয়া মহাপুরুষজীর ঘরে

গিয়া দেখি তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন। বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার পর কতকগুলি স্ত্রী-ভক্ত আসায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরাও আর অপেক্ষা না করিয়া ঠাকুরঘরে যাইলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মহাপুরুষজীর ঘরে উপস্থিত হইলাম। তখন প্র-বাবু সেখানে ছিলেন। বোধ হয় তিনি কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহাপুরুষজী বলিতেছিলেন, "দেখ, প্রথম প্রথম পরের উপকার, এসব কাজ সকাম হয়। পরে নিষ্কাম হয়। লোক কি প্রথমেই নিষ্কাম হতে পারে? তা পারে না। পরে সব আস্তে আস্তে হয়; কিন্তু পরের উপকার সকামভাবে হলেও করা ভাল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—নিষ্কামভাবেই কর্ম্ম করবে, তাতেই প্রকৃত শান্তি। যদি কেউ নিষ্কামভাবে কিছু করতে চায় তবে ভগবানই তাকে সব জানিয়ে দেন। তখন আর কোন গোল থাকে না। যদি কেউ মিছরির আস্বাদন পায় তা হ'লে আর সে চিটে গুড় খেতে চায় না। তবে প্রথম প্রথম আস্বাদ পাওয়া যায় না। তাই গীতায় অভ্যাযোগের কথা আছে।" ইহারই মধ্যে কিছুক্ষণ মহাপুরুষজীর পদসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কা-বাবু Blind School (অন্ধ বিদ্যালয়)-এর Exhibition-এর (প্রদর্শনীর) কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মহারাজজী বলিলেন—"বড়ই আশ্চর্য্য। মহামায়ার আশ্চর্য্য শক্তি।"

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঠাকুরঘরে আরতি হইতেছে। আমরা আরতিদর্শন করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া ৭-৩০-টার স্টীমারে 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আসি।

'উদ্বোধনে' তখনও ঠাকুরের আরতি হইতেছিল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাঁহার ঘরেই ছিলেন। আমরা আর তাঁহার ঘরে না গিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে সংবাদ পাইলাম ঐ দিনই রাত্রিতে ৮-১৫ মিঃ সময়ে তিনি apoplexyতে (সন্ন্যাসরোগে) আক্রান্ত হন।

* * *

১৩ই আগষ্ট, ১৯২৭, শনিবার। অফিসের পরে মঠে উপস্থিত হইলাম। মহাপুরুষজীর ঘর। ম-মহারাজ পূজনীয় শরৎ মহারাজের অসুখের দৈনন্দিন খবর দিয়া বলিলেন—"শরৎ মহারাজ আজ একটু ভাল আছেন।"

কথায় কথায় স্থ-মহারাজের একনিষ্ঠ সেবার কথা উঠিল।

ম-মহারাজ—"স্থ-মহারাজ খাওয়াতে খুব পটু। মহারাজকে অতি সুন্দরভাবে খাওয়ান। আর কেউ ঐ রকম পারে না।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, স্থ- এসব বিষয় খুব পারে। দেখ, এরা শরৎ মহারাজের কত সেবা করেছে। এদের বার বৎসর সাধন ভজন করে যা না হতো এই কয়দিনের সেবায় তা হয়ে গেল।"

ম-মহারাজ—"হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদের সাধন-ভজনের শক্তি কোথায় ? আপনাদের সেবা করতে পারলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়।"

আমি—"মহারাজ, পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ভাল হলেই মঙ্গল। তিনি জগতের কত কল্যাণ করছেন। আমি রোজ মা কালীর কাছে তাঁর আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করি।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, তোমরা তো মায়ের কাছেই আছ, (আমি তখন কালীঘাট অঞ্চলে থাকি) ঐরূপ প্রার্থনা করবে বৈ কি।

জগতের কল্যাণের জন্যই শরৎ মহারাজের শরীর থাকা প্রয়োজন। আহা, তিনি সেরে উঠুন।”

এই সময় জি-মহারাজ আসিয়া বলিলেন—“মহারাজ, একখানা চিঠি এসেছে দীক্ষার জন্য।”

মহাপুরুষজী—“এখন এসব হবে না। যখন হয় হবে। লিখে দাও—পরে যেন চিঠি পত্র লেখে। শরৎ মহারাজের অসুখ, মন বড় খারাপ।”

আমরা কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিয়া আবার মহাপুরুষজীর নিকট সমবেত হইলাম, তখন তিনি তামাক সেবন করিতে করিতে প্র-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, “শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শে সমাজ ক্রমশঃ পুনর্গঠিত হবে।”

* * *

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, শনিবার, বৈকাল সাড়ে চারিটা। মহাপুরুষজী তাঁহার ঘরে অবস্থান করিতেছেন। প্র-বাবু, য-বাবু, ন-বাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। আমি আসিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলাম। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ঢাকা যাইবেন, তাই প্রণাম করিতে আসিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইবার পর, মহাপুরুষজী বলিলেন, “দেখ, জ্ঞানেশ্বর আমেরিকা যাবে, তাই একবার ঢাকায় ঘুরে আসতে যাচ্ছে। সীতাপতি (স্বামী রাঘবানন্দ) ফিরে আসছে, তার শরীর খারাপ হয়েছে। সে হরিপদর (স্বামী বোধানন্দ) নিকট ছিল, তাকে assist (সহায়তা) করত। সে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত এসে গেছে। কোন সাধুর আমেরিকাতে পাঁচ বৎসরের বেশী থাকা উচিত

নয়। কারণ West-এর (পাশ্চাত্ত্যের) একটা impression (ছাপ) mind-এ (মনে) পড়ে যায়। সীতাপতি বহু দিন পরে আসছে শরৎ মহারাজকে দেখবে বলে। কলম্বো এসে এই দুঃসংবাদ পেয়ে তার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সে এখন মাদ্রাজে আছে। শীঘ্রই আসবে। আহা! শরৎ মহারাজের জন্য কত লোকেরই না কষ্ট হয়েছে! তিনি কত লোকের কল্যাণ করতেন! ওঁরা সকলেই একে একে চলে যাচ্ছেন দেখে ভক্তদের ভয় হয়েছে। তাই এখন দীক্ষার জন্য আমাকে বড় জোর তলব দিচ্ছে (এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন)। ভক্তরা মনে করছে কবে আমিও চলে যাই। তা শ্রীশ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। আমাদের ইচ্ছায় কিছু হবে না। শরৎ মহারাজের যে শনিবার অসুখ হয়, তার আগের সোমবার এখানে Mission-এর annual general meeting-এ (মিশনের বাৎসরিক সভায়) এসেছিলেন। তখন আমাকে বললেন, 'দেখুন, শরীরটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বোধ হয় আর বেশীদিন টিকবে না।' আমি বললুম, 'তাই তো', কিন্তু তখনও আমার মনে হয় নি যে এত শীঘ্র চলে যাবেন। শনিবার তো অসুখ হল। আর একরকম বলতে পারা যায় ঐ দিনই হয়ে গেল। তবে যে এই কয়দিন ছিলেন ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য। কত লোক কত জায়গা থেকে এলো, কত সেবা করলে, এই বার দিন প্রাণপাত করে সেবা করলে! বোধ হয় এজন্যই এ ক'দিন ছিলেন। হঠাৎ দেহত্যাগ হয়ে গেলে কত লোকের মনে দুঃখ থাকত, কিন্তু তা হলো না। সকলেই প্রাণভরে দেখে ও সেবা করে নিলে। এই বার দিন কোন physical sense

(দৈহিক জ্ঞান) ছিল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্ঞান ছিল। গঙ্গাধর মহারাজ 'দাদা, দাদা' বলে ডাকতে চক্ষু মেলে চেয়েছিলেন, পরে চক্ষু বুজলেন। ডাক্তার বিপিনবাবুও 'শরৎ, শরৎ' বলে ডাকতে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। বিপিনবাবু বললেন, 'শরৎ, চা খাবি ?' তা মাথা নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরে ঠাকুরের চরণামৃতের কথা বলতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন; ঠাকুরের চরণামৃত দেওয়া হল, তা খেলেন। ভিতরে ভিতরে জ্ঞান ছিল। তা থাকবে না? এমন যোগী পুরুষ, শ্রীশ্রীমার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত—সমাধিতে দেহত্যাগ করলেন। একেবারে মার নিকট চলে গেলেন, ঠাকুরের নিকট চলে গেলেন। অবশ্য আমাদের থাকবার ইচ্ছা থাকলেও থাকার জো নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের call (ডাক) এলে যেতেই হবে। তবে আমরা সর্ব্বদাই ready (প্রস্তুত) হয়ে আছি। আমাদের যাবার কি থাকবার কোন ইচ্ছাই নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। তিনিই সব জানেন। মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী) যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভক্তদের বড় ভালবাসতেন। ভক্তদের জন্য এঁরা দেহধারণ করে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা তা-ই হবে। এঁরা সব শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন। শেষ সময়ে ভক্তদের সকলেই ঠাকুরের দর্শন পান। তিনি নানা রূপে দর্শন দেন।"

মহাপুরুষজীর জলযোগ করিবার সময় হইল। আমরা বাহিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঘরে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের আঙ্গুর প্রসাদ দিলেন। সু-বাবু ও পূ-বাবু আসিলেন। তাঁহারাও আঙ্গুর প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর মহাপুরুষজী

বেড়াইবার জন্য নীচে নামিলেন। সন্ধ্যা হইল। আরতি দর্শন করিয়া আবার মহাপুরুষজীর নিকটে গেলাম। তিনি তখন মঠের নীচের বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। সু-বাবু ও পূ-দা তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। আমাকে ডাঃ বিধান রায় চিকিৎসা করিতেছেন শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "বিধান রায় খুব ভাল ডাক্তার। কলিকাতায় এখন বিধান রায় ও বিপিন বাবু। তোমার সঙ্গে বিধান রায়ের আলাপ ছিল ?"

আমি—"হ্যাঁ, মহারাজ। অনেকদিন যাবৎ আলাপ আছে, তিনি আমাকে বেশ ভালবাসেন।"

মহাপুরুষজী—"তাই নাকি ? তা বেশ, তুমি ঔষধ খেয়ে যাও।"

মহাপুরুষজী আমার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও যথাযথ উত্তর দিলাম। এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। তিনি উপরে নিজের ঘরে গিয়া আরাম কেদারায় বসিলেন। আমরা যে যেখানে পারিলাম স্থান করিয়া লইলাম। এমন সময় 'উদ্বোধনে'র ডাক্তার মহারাজ আসিলেন। তাঁহার সহিত শরৎ মহারাজের ভাণ্ডারার (উৎসবের) কথা হইল।

মহাপুরুষজী—"কেমন, হিসাব চুকে গেছে ত ? কত টাকা খরচ হলো ?"

ডাক্তার ম- —"হ্যাঁ, মহারাজ, সব চুকে গেছে। প্রায় ২৩০০৲ টাকার মত খরচ হল। তা হয়ে গেছে। কিন্তু এত খরচ হবে মনে হয় নি। এখনও টাকা আসছে।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে না ? তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন।

মার বিশেষ কৃপা তাঁর উপর ছিল। তাঁর কাজ কি কখনও অসম্পূর্ণ থাকবে? তিনি কত লোকের জীবন তৈরী করে দিয়েছেন, কত নর-নারীর কল্যাণ করেছেন, কত লোককে উদ্ধার করেছেন। তিনি দেহত্যাগ করেছেন মনেই হয় না—মনে হয় তিনি 'উদ্বোধনে' ঠিক বসে আছেন।"

ডাক্তার ম- —"হ্যাঁ, মহারাজজী, তা বৈ কি। তিনি আর গেছেন কোথায়? আপনারা তো সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্ছেন, তবে আমরা স্থূল শরীরটা দেখতে পাই না বলেই মনে এত কষ্ট হচ্ছে। আপনারা পেছনে থাকলে আমাদের কত বল, ভরসা—কত উৎসাহ হয়।"

মহাপুরুষজী—"তা বৈকি। তিনি এখন ঠাকুরের কাছে আছেন। শরৎ মহারাজ বৈকাল চারটার পর কত মেয়েদের উপদেশ দিতেন! সেই মেয়েরা প্রায় সাতটা পর্য্যন্ত থাকত। পরে আবার পুরুষভক্তরা আসত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের উপদেশ দিতেন। কত লোক তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। যারা তাঁকে ভাবছে তারা ঠাকুরকেই ভাবছে। কারণ ঠাকুর তো এঁদের মধ্যেই আছেন। সকল ভক্ত তো ঠাকুরকে দেখে নাই। এঁদের—মহারাজ, হরি মহারাজ, বাবুরাম মহারাজকে—যারা দেখেছে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে, তারা ঠাকুরকেই দেখেছে।"

ডাক্তার ম- —"এবার পূজা কি রকম হবে, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী—"এবার ঘটে-পটেই পূজা হবে। কৃষ্ণলালের অসুখ আর আমাদেরও মন ভাল নয়। এবার ঘটে পূজা করাই ভাল। (ভক্তদের প্রতি) তোমাদের কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে।"

ঘড়ি দেখিয়া বলিলাম ৮টা বেজেছে—সাড়ে ৮ টায় যাব'খন। তৎপরে য-কে বলিলেন, "তোমাদের বরিশালে অশ্বিনী বাবুর খুব নাম।"

য—"হ্যাঁ, মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"অশ্বিনীবাবুর বাবা ব্রজমোহন দত্ত Sub-judge (সহকারী জজ) ছিলেন। একদিন তিনি ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। একটা নূতন কলেজ স্থাপন করবেন এ বিষয়ে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছিলুম।"

সু-বাবু—"আচ্ছা, শ্রীশ্রীঠাকুর কি এসব বিষয়েও লোককে আশীর্ব্বাদ করতেন, উপদেশ চাইলে দিতেন?"

মহাপুরুষজী—"দিতেন বৈ কি।"

সু-বাবু—"ঐ ভদ্রলোককে দিয়েছিলেন কি?"

মহাপুরুষজী—"তা বলতে পারি না। আমরা ওসব কথায় থাকতুম না।"

আমি—"মহারাজজী, শ্রীশ্রীঠাকুর কি দীক্ষা দিতেন?"

মহাপুরুষজী—"খুব কম দিতেন।"

আমি—"তবে অনেককে স্পর্শ করে দিতেন, চৈতন্য হউক—এসব বলে দিতেন তো?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, তা করতেন, তাও সকলকে নয়।"

আমি—"শ্রীশ্রীঠাকুর কত রকম সাধনভজন করেছিলেন! ভগবানকে দেখার জন্য, তাঁকে পাবার জন্য কি ব্যাকুলতাই তাঁর ছিল!"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, তা ছিল বৈ কি। তিনি জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য এই সব করেছিলেন।"

আমি—"মহারাজজী, যারা সংসারী লোক, তারা তো অত সব করতে পারবে না। তাদের কি হবে?"

মহাপুরুষজী—"তাদের এই জন্মে হবে না। ভগবানের উপর একটা টান না এলে পর কি করে তাঁকে পাবে? একটু টান চাই। যতক্ষণ তা না এল, ততক্ষণ কিছুই হবে না। ঠাকুর বলেছেন যে, যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে খেলে, ততক্ষণ মার কোন চিন্তা থাকে না। যখন চুষি ফেলে ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকে, তখন মা এসে ছেলেকে নিয়ে যায়। 'কথামৃত' রোজ পড়তে হয়। এসব কথা 'কথামৃতে' আছে। দু'এক বার পড়লে হবে না, খুব পড়তে হয়। 'কথামৃত' full of light (আলোয় পূর্ণ)।"

সু-বাবু—"আচ্ছা মহারাজ, আমাদের তো শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর এত টান হয় না, যতটা আপনার জন্য হয়—আপনাকে দেখবার জন্য, আপনার একখানা চিঠি পাবার জন্য যতটা হয়।"

মহাপুরুষজী—"আমাদের উপর যদি তোমাদের টান থাকে তবেই তো হলো। আমরা তো ঠাকুর বই কিছু জানি না। আমাদের ভাবলেই ঠাকুরকে ভাবা হলো। আমাদের ঠাকুরই all-in-all (সর্ব্বেসর্ব্বা)। আমাদের যদি তোমরা ভাব, তবে ঠাকুরকেই ভাবা হল। ঠাকুর আমাদের মধ্যেই আছেন, তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যেই আছেন।"

সু-বাবু ও পূ-দা—"আপনিই তবে আমাদের কৃপা করুন, মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"কৃপা তো করছিই। যখন দীক্ষা দিয়েছি, তোমাদের ভালবাসছি, তখন কৃপা তো আছেই।"

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, রবিবার। বেলুড় মঠ। বিকাল বেলা প্রায় ৫-৩০ টায় মঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজজীর শরীর বিশেষ অসুস্থ—জ্বর ও হাঁপানিতে কষ্ট পাইতেছেন। আজ কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। তাই ভক্তগণ অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শন করিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক বেড়াইয়া সন্ধ্যা ৬টার ষ্টীমারে চলিয়া গেলেন। দ্বি-মহারাজ সু-বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা মহাপুরুষজীকে দর্শন করবে না?" আমরা বলিলাম্, "কি করে হবে? শুন্‌ছি কাউকেই যেতে দেওয়া হবে না।" দ্বি-মহারাজ বলিলেন, "তোমরা একটু পরে দর্শন করো।"

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম এবং একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঐপ্রকার অসুস্থতার মধ্যেও অ-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ এখন ভাল আছ?" অ-, "হ্যাঁ, মহারাজ, এখন একটু ভাল আছি।" পরে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজকে দর্শন করিয়া 'উদ্বোধন' হইয়া শ-র বাসায় পৌঁছিলাম।

* * *

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮। বেলুড় মঠে আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজা। বেলা ২-৩০ টার সময় মঠে যাইয়া পৌঁছিলাম। মহাপুরুষজী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে বহুভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। বহু দিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল। কারণ এতদিন তিনি মধুপুর ও কাশীতে ছিলেন। প্রণাম করিয়া নিকটে বসিতেই মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?" অ-, "খুব ভালও নয়, মন্দও নয়।" মহাপুরুষজী—"তা মা যতদিন আছেন এই ভাবেই চলুক, মার সেবা করে যাও। কাশীতে তোমার মার সঙ্গে দেখা হ'ত—

তিনি প্রায়ই আসতেন। এখন কেমন আছেন? চিঠিপত্র পাও তো?” অ-, “হ্যাঁ মহারাজ, পাই।” একজন ভক্ত আসিতেছেন আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ, কেমন আছেন?” আর তিনি ক্রমাগত বলিতেছেন, “না, শরীর তত ভাল নয়। তবে বুড়ো শরীর এই রকমই হয়ে থাকে, এভাবেই চলবে। এখন কেবল patchwork (তালি দেওয়া) চলছে। এভাবেই তাঁর ইচ্ছায় যত দিন চলে।”

মৃ-বাবু জনৈক ভদ্রলোককে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। ভদ্রলোকটি সুগায়ক। তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া মৃ-বাবু বলিলেন, “মহারাজ, এই ভদ্রলোক বেশ গাইতে পারেন, আজ সকালে ইনিই গেয়েছিলেন।”

মহাপুরুষজী (খুশী হইয়া)—“দেখ, গানের মত এমন জিনিস নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর গান বড় ভালবাসতেন। নিজেও খুব গাইতে পারতেন। তিনি গান গেয়ে সকলকে মোহিত করতেন। গান তাঁর একটা মস্ত শিক্ষা ছিল। তিনি কিন্তু তোমাদের মত ওস্তাদের কাছে গান শেখেন নি। তা বলে তালমান সব বোধ ছিল। এমন করে গাইতেন যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন! ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন, যাঁরা শুনতেন তাঁরাও খুব আনন্দ পেতেন।”

মৃ-বাবু—“ইনি আমাদের গান শেখাচ্ছেন।”

মহাপুরুষজী—“খুব ভাল কথা। দেখ, এদের গান শেখাবে যেন ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে আর আনন্দ পায়। এমনি সব গান শেখাবে—ওস্তাদী গানের দরকার নেই। তা—না—না—করে রাগিনী ভাঁজলে কি হবে? যাতে ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস হয়, তাই শেখাবে। ওস্তাদী গান মন্দ—আমি তা বলছি না। তা যারা শেখে শিখুক।

স্বামীজী ছিলেন গানে ওস্তাদ। তাঁর বাবা মাষ্টার রেখে তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। তিনি এমন গান গাইতেন যে সকলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন স্বামীজীর গান শুনতেন, তখন একেবারে বিভোর। তিনি বলতেন, 'নরেন যখন গানে হা বলে টান দেয়, তখন আমার ভিতরে পদ্মগুলি জেগে ওঠে। আর আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি'।"

জনৈক ভক্ত—"আজকার Weather (আবহাওয়া) দেখে ভয় হয়েছিল। কি মেঘ! যাক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বৃষ্টি হয় নি।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, আমাদেরও খুব ভয় হয়েছিল, তা তাঁর কৃপায় ভক্তদের কোন কষ্ট হয় নি। আহা! আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন, কত লোক আসছে—প্রসাদ পাবে। বৃষ্টি হলে কি রক্ষা ছিল? একে আমাদের জায়গা নেই।"

কৃষ্ণলাল মহারাজ আসিলেন—তাঁহার পেটের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া মহারাজজী ব্যস্ত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণলাল, কিছুই খেলে না। বরং ডাব খাও একটা।" ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আরতি দর্শন করিয়া বাগবাজার হইয়া শ-র বাসায় পৌঁছিলাম।

* * *

৩রা মার্চ্চ, ১৯২৮, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। আজ আফিস হইতে বাহির হইয়া বেলা ৩-১৫ মিঃ মঠে পৌঁছিলাম। পূজনীয় মহাপুরুষজীর ঘরে তখন অন্য কেহ ছিল না। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ? মা কেমন আছেন? চিঠি পাওতো? সেখানে শীত কেমন ইত্যাদি।" আমিও যথাযথ উত্তর দিয়া নীরব হইলাম, কারণ তাঁহার শরীর তত

সুস্থ নয়। এমন সময়ে স্বামী পরমানন্দজী আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমেরিকাতে আমাদের মঠের একটি ছবি নেব ; কারণ তথায় ভক্তরা আমাদের মঠের সকলকে দেখতে চায়। যদি আপনার কষ্ট না হয়, তবে দয়া করে নীচে একবার আসুন।" তিনি এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন, পরে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া মহাপুরুষজী সহ আমাদের সকলকে লইয়া নীচে গেলেন। আমরা মহাপুরুষজীর সহিত মঠের উত্তরদিক হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে আসিলাম। তারপর আবার পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম, এই অবসরে movie (চলচ্চিত্র) তুলিয়া লওয়া হইল। মহাপুরুষজী ক্লান্ত হইয়া মঠের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় যাইয়া একটু বসিলেন, পরে উপরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যারতির পর পুনরায় মহাপুরুষজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

প্র-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন কেমন আছেন?"

মহাপুরুষজী—"না, ভাল নেই, বাবা। Heart-এর palpitation হয় (বুক ধড়ফড় করে)। বায়ু আছে, weakness (দুর্ব্বলতা)—এই সব warning (সঙ্কেত) দিচ্ছে—আর বেশী দিন নয়। Call (ডাক) দিচ্ছে—be ready (প্রস্তুত হও)। তা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় প্রস্তুত আছি।"

এই কথা শুনিয়া প্র-বাবু ও আমি বলিলাম, "মহারাজ, আপনি তো বললেন, কিন্তু আমাদের উপায় কি? আমরা তো আপনাদের আশ্রয়েই আছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদই তো আমাদের জীবনের সম্বল।"

মহাপুরুষজী—"তা তোমাদের ভাবনা কি? শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকেই দেখছেন ও দেখবেন। তোমাদের কোন ভাবনা নেই। তোমরা ঠিক থাকবে। কোন ভয় নেই। তিনি চৈতন্যময় সকলের হৃদয়ে আছেন ও থাকবেন। তবে আমার এই রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে যেরূপ দেখাশোনা—তা আর হবে না। তা বলে ভয় কি? তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত। তোমাদের মঙ্গল হবেই।"

আমরা—"আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর আমাদের মন থাকে।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, থাকবে। কোন ভয় নেই তোমাদের।"

তারপরে অ-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"অ-, তোমার মায়ের খবর কি? চিঠিপত্র পাও তো? (কথাগুলি খুব উৎসুকভাবে বলিলেন)। বুড়ী বড় ভাল মানুষ, ধার্ম্মিক, সরল। যখন চিঠি দিবে আমার আশীর্ব্বাদ তাঁকে জানাবে।"

অ- —"হ্যাঁ মহারাজ, নিশ্চয়ই জানাব। আপনি যখন ওখানে (কাশীতে) ছিলেন, প্রত্যেক চিঠিতেই আপনার কথা আমাকে লিখতেন।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ।"

অ- —"মারও মন সেখানেই পড়ে আছে। আমার নিকট এখানে আসতে চান না। ৺বিশ্বনাথেরই চিন্তা।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, বুড়ীর আর কোন কামনা নাই। কিসে তোমাকে রেখে ৺বিশ্বনাথের দর্শন পাবেন এই ভাবনা। তা পাবেন, বড় সরল।"

অ- —"মহারাজ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, মার যেন ⁄বিশ্বনাথ দর্শন হয়।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। তাঁর আর কোন কামনা নাই। কেবল আমাকে বলতেন যেন তোমাকে রেখে ⁄বিশ্বনাথের কাছে যেতে পারেন। হবেও তাই, আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

অ- —"আমি এপ্রিল মাসে ছুটি নিয়ে কাশী যাব।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, একবার যেও, তুমি দেখে এলে বুড়ী খুশী হবে।"

* * *

১০ই মার্চ্চ, ১৯২৮, শনিবার। বেলুড় মঠ। বেলা ১টার সময় মঠে পৌঁছিলাম। মহাপুরুষজী তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। আমি প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলাম। সেদিন উপস্থিত ছিলেন স-বাবু। আমাদিগের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় আসিলেন ন-বাবু। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

মহাপুরুষজী—"আজ শুনছি তোমাদের ওখানে থিয়েটার হচ্ছে। এই অ-দের আফিসের বাবুরাই benefit night (সাহায্য রজনী) দিচ্ছে। প্রায় হাজার টাকার মত টিকেট বিক্রয়ও হয়েছে। তুমি এবার জমিটা দাও না? ছু'-চার কাঠা জমি দিলেই ত হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ হচ্ছে, এতে আর তুমি দেরি করো না। এদেরও এবার টাকার যোগাড় হয়ে গেল। তোমার আর কি? তুমি তোমার বাবার নামেই বরং দিও। তাঁর নাম থাকবে।"

ন-বাবু আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপুরুষজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"কেন বলছ যে তোমার

জমির উপর মায়া—তোমার আবার মায়া কি? তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের লোক। রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজের লোক—আমাদের লোক। তোমার আবার মায়া কি? স্ত্রী-পুত্র নেই, না ঢেঁকি, না কুলো—তুমি তো এমনিই মুক্ত। আবার কি? এবার দিয়ে দাও, কাজ হয়ে যাক।" ইহার পর স-বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শরৎ মহারাজ চলে গেলেন। তোমাদের কত ভালবাসতেন! আমরাও যাবার জন্য ready (প্রস্তুত)।" কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাহিরে গেলেন ও পরে ফিরিয়া মঠের দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসিলেন। আমিও তাঁহাকে একাকী পাইয়া নিকটেই বসিলাম। আমি ছুটি পেয়েছি এবং কাশীতে যাব বলিলাম। মহাপুরুষজীও আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"তা বেশ, এপ্রিলে তত গরম হবে না। বেশ হবে, মাকেও দেখে আসবে, একটু change (বায়ু-পরিবর্ত্তন) হবে।"

এমন সময় খ-মহারাজ তাঁহার স্কুলের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেরা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া নীচে চলিয়া গেল। খ-মহারাজ মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, কয়েকটি ছেলে দীক্ষা চায়।"

মহাপুরুষজী—"দীক্ষা কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের নামই দীক্ষা। আবার কি? খুব করে ঠাকুরের নাম করুক ও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়ুক। তবেই দীক্ষা। আবার কি?"

* * *

২৮শে এপ্রিল, ১৯২৮, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। আফিসের পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণী-মাকে দর্শন করিয়া ষ্টীমারযোগে যখন মঠে পৌঁছিলাম তখন বেলা ৬-৩০টা হইবে। সূর্য্য পশ্চিম

আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি রৌদ্রের উত্তাপ বেশ ছিল। মহাপুরুষজী তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণসংলগ্ন ছাদে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রণাম করিতেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অ- —"মহারাজ, ইচ্ছা হয় শ্রীশ্রীঠাকুর আফিসের কাজের জন্য যতটুকু সময় দিয়েছেন ততটুকুই যেন করি। অবশিষ্ট সময় যেন তাঁর নামে কাটাতে পারি।"

মহাপুরুষজী—"বাকী সময় তাইতো করবে। আফিস থেকে এসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে খুব তাঁর নামজপ, ধ্যান, ভজন করবে। তোমাদের আর কি কাজ? সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করবে। আর যতদিন গর্ভধারিণী মা আছেন, ততদিন তাঁর সেবা করবে। এই duty (কর্ত্তব্য) পালন করবে।"

অ- —"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা এ জীবনে খুব পেয়েছি—তাই দাঁড়িয়ে আছি। তিনি কৃপা করছেন বলে আমাদের রক্ষা। তা না হলে কি আর আমাদের উপায় ছিল?"

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছ। তাঁর দয়াতে তোমরা বেঁচে গেছ বই কি।"

অ- —"শ্রীশ্রীঠাকুরের খুবই কৃপা, তা না হলে আমরা সাধনভজন করে তাঁকে লাভ করব, এ শক্তি আমাদের কই?"

মহাপুরুষজী—"আরে রাম বল। সাধনভজন করে তাঁকে লাভ করা—সে তোমাদের সাধ্য কি? তিনি তোমাদের কৃপা করে টেনে নিচ্ছেন। তাঁর কৃপা, তাঁর কৃপা—কৃপা—কৃপা।"

অ- —"এখন আশীর্ব্বাদ করুন শেষ পর্য্যন্ত যেন তাঁর শ্রীচরণে মন থাকে। তবেই ধন্য হব।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে, নিশ্চয়ই হবে। এতে আর সন্দেহ কি?"

এমন সময় প-বাবু আসিলেন। তিনি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সাংসারিক কথা বলিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে? বাস্তবিক তাঁহার দুঃখের সংসারের কথা শুনিলে চোখ দিয়া জল আসে।

প-বাবু—"মহাপুরুষজী, আমাদের সব শেষ করে দিন। আর ভাল লাগছে না।"

মহাপুরুষজী—"তা কি হয়, বাবা। সংসারে এ সব হবেই। এরই নাম সংসার। আমরাও তাঁর কাজের জন্য তাঁরই ইচ্ছাতে এখানে রয়েছি। আবার কাজ শেষ হলে ঠাকুরই ডেকে নেবেন।"

প-বাবু—"আপনিও যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে যান।"

মহাপুরুজী—"আরে ছি, ও কথা কি বলতে আছে? শ্রীশ্রীঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তাই হবে।"

পূ-বাবু আসিলেন। সন্ধ্যাও হইল। আরতি দর্শন করিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

* * *

৫ই মে, ১৯২৮, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। মঠে পৌঁছিয়া মহাপুরুষজীর দর্শন পাইলাম। কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিলেন—"দেখ, মাকে যে যন্ত্রণা দেয় তার কি কখনো ভাল হয়? একজনের মা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলেকে দেখতে চাইলে, কিন্তু ছেলে গেল না অথচ এখানে তার কোনই জরুরী কাজ ছিল না। দেখ, মা গর্ভধারিণী, তাঁকে দেখলে না। এদের আবার কি ধর্ম্ম হবে? মা

মৃত্যুশয্যায় দেখতে চাইলে, দেখা দিলে না। যাঁর জন্য দুনিয়া দেখলে তাঁকে দেখলে না। মার মত কি সংসারে আর কেউ আছে?”

* * *

১লা জুলাই, ১৯২৮, রবিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। বেলা ৪-৩০ টার সময় মঠে পৌঁছিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুজীর শ্রীচরণদর্শন করিলাম। আমার শরীর ভাল নহে শুনিয়া তিনি বলিলেন—“তবে আজ এই বর্ষার মধ্যে কেন এলে? আজ আর রাত করো না। ৬-৬মিঃ-এর ষ্টীমারে চলে যেও।” জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া মহাপুরুজীকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মহাপুরুজী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন—“আমার কন্যা রথদ্বিতীয়ার দিন আপনার নিকট দীক্ষা নিয়েছে। আপনার শিষ্যা আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে।”

মহাপুরুষজী—“বাবা, কে আমার শিষ্যা? আমিই বা কার গুরু? গুরু এক ভগবান। তিনিই সকলের গুরু। মানুষ গুরু কখনো হয় না। আমাদের ঠাকুর বলতেন, ‘গুরু, কর্ত্তা, বাবা—এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। মানুষ আবার গুরু কি? মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না। ভগবানই সকলের গুরু।’ আমরাও পরে ভাগবতে দেখেছি—ভগবান বলছেন, যখন কেউ কাউকে দীক্ষা দেয় তখন আমিই দীক্ষাদাতার ভিতর আবির্ভূত হয়ে মন্ত্র দেই। এই হচ্ছে সত্য কথা। মানুষ গুরু কখনো হতে পারে না। গুরুকে মানুষবুদ্ধিতে দেখলে কখনো ভগবানলাভ হয় না।”

* * *

৭ই জুলাই, ১৯২৮, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। মহাপুরুষজীর ঘর। তিনি তখন প-মহারাজের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন।

প-মহারাজ—"Emotion (আবেগ)-ই সব। Reason (বিচার) কেবল একটু guide (পরিচালনা) করে মাত্র। Emotion (আবেগ) না থাকলে ধর্ম্মই হয় না। পূজনীয় হরি মহারাজও এই কথা বলেছিলেন যে emotion (আবেগ)-ই মানুষকে টেনে ধর্ম্মপথে নিয়ে যায়। Reason (বিষয়) কেবল একটু help (সহায়তা) করে মাত্র। Intellect (বুদ্ধি) দ্বারা ধর্ম্ম বুঝতে পারা যায় না।"

মহাপুরুষজী—"Intellect (বুদ্ধি) দ্বারা সেই অব্যক্তকে ধরবে! তুমি যে আমাকে 'নাসদীয় সূক্ত' (ঋগ্বেদ) লিখে দিয়েছিলে তা আমি মধ্যে মধ্যে পড়ি। বড় চমৎকার। কি সব সুন্দর ভাবই না আছে! ঐ যে খাতাখানা রয়েছে টেবিলের উপর একটু পড় না।"

প-মহারাজ শ্লোকগুলি পড়িলেন। মহাপুরুষজীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিলেন এবং পরে আবার সব অর্থ বলিলেন, "সৃষ্টির প্রথমে সেই অব্যক্তকে কেউ জানতে পারে নি। কি করেই বা জানবে? যদি কেউ বলে 'জেনেছি' তবে সে কিছুই জানে নি। দেখ, এ সব ভাব বড় উচ্চ দরের। এ সব সাধারণ ভক্তদের জন্য নয়। তারা এ সব কথা বুঝতেই পারবে না। কারণ এ সব ধারণা করা যোগী ভিন্ন অন্য কারুর সামর্থ্য নাই। যেখানকার সব কথা এই শ্লোকে আছে, তা বাক্য-মনের অতীত অবস্থার কথা। সাধারণ লোক অবতারলীলা বুঝতে পারে। তারা ভাবে ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন। তাঁকে সেবা, বন্দনা, পূজা, পাঠ দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করে;

কিন্তু এ জ্ঞানের কথা তারা বুঝতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্দরমহল পর্য্যন্ত যেতে পারে আর জ্ঞান কেবল বাহির মহল পর্য্যন্তই যেতে পারে।' "

প-মহারাজ আর একটি শ্লোক পড়িলেন। তাহার অর্থ—অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, ইত্যাদি।

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, এর চেয়ে আর কথা নাই। উঃ, কি সুন্দর জ্ঞানের কথা! স্বামীজী এই শ্লোকটি যখন বলতেন তখন কি সুন্দর ভাবেই যে আমাদের বুঝাতেন, তা তোমাদের আর কি বলব? তিনি এই শ্লোকটি বড়ই ভাল বাসতেন। তাঁর কোন কোন বই-এ একথা আছে।"

প-মহারাজ—"হ্যাঁ, মহারাজ, আমরা পড়েছি। 'বীরবাণী'তে আছে, 'অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু'।"

মহাপুরুষজী—"পূর্ব্বে কবিরা এ সব ধারণা করত। তাই এখন দেখ emotion (হৃদয়াবেগ) আগে, reason (বিচার) তার পরে।

* * *

২৯শে জুলাই, ১৯২৮, শনিবার। স্থান—বেলুড় মঠ। বৈকাল ৪টা। মহাপুরুষজীর ঘর। ঘরে পাঁচ-ছয় জন ভক্ত বসিয়া আছেন। মহাপুরুষজী তাঁহাদের সহিত বেলুড়ের ট্রেন-দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কথা বলিয়া বলিলেন, "তাঁর (ভগবানের) যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। কত লোকের প্রাণ গেল!" কথাগুলি বড়ই বেদনামাখা।

একজন ভক্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপুরুষজী, আপনার শরীর কেমন?"

মহাপুরুষজী—"শরীর ভাল নয়। বুড়ো শরীরে এরূপই হয়।"

ভক্ত—(দুঃখ করিয়া) "মহারাজজী, শরীরটা নিয়ে আপনি খুব ভুগছেন। আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

মহাপুরুষজী—"কেন? শরীর নিয়ে কি কথা? মন বেশ আছে। এতে আমার কোন কষ্ট নেই। 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' —এই-ই কথা। শরীর যেমনই থাকুক, মন ভাল থাকলেই হলো। তা মন আমার ভাল আছে। ৫০ বছর সাধুগিরি করে কি এখনও শরীরের দুঃখে দুঃখিত হব? তবে এতদিন ঠাকুরকে কি ডাকলুম!"

কথায় কথায় আবার ট্রেনসংঘর্ষের এবং দেশের দুর্ভিক্ষের কথা উঠিল। মহাপুরুষজী বলিলেন—"কি করা যাবে? ভগবানের কি ইচ্ছা বলা যায় না। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, আবার train disaster (ট্রেন-দুর্ঘটনা)। কি যে হবে তিনিই জানেন।"

* * *

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। বৈকালের দিকে মঠে গিয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীকে দর্শন ও চরণবন্দনাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি এরকম প্রার্থনা করা যায়—'হে প্রভো, তুমি আমার শরীরটা একটু ভাল রাখ, যাতে তোমার নাম করতে পারি।'"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরূপ প্রার্থনা খুব করবে। তাতে কিছু দোষ নেই। শরীর ভাল না থাকলে কে তাঁর নাম করতে পারে?"

অ-—"মহারাজ, এখন মনে হয় যেন খুব তাঁকে ডাকতে পারি—সাধন-ভজন করতে পারি। তিনি যতটুকু সময় দিয়েছেন তার যেন

সদ্ব্যবহার করতে পারি, আরও বেশী সময় দিলে যেন সুবিধা হয় ও তাঁর ভাবেই যেন ডুবে থাকি।"

মহাপুরুষজী—"ক্রমে তা পারবে। তাঁকে বলবে, প্রার্থনা করবে, তবেই হবে।"

অ- —"মহারাজ, খাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি ?"

মহাপুরুষজী—"তা একটু আছে বই কি। গরম জিনিস খেলে পেট গরম হয়। পেট গরম হলে সাধন-ভজন করা যায় না। তা ছাড়া excitement (উত্তেজনা) হয়, নানা অনর্থ ঘটে।"

অ- —"মাংস, ডিম, পেঁয়াজ—এসব খেলে কি পেট গরম হয় ?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, সাধারণ গেরস্থরা মাংস ডিম খেতে পারে, কিন্তু যারা সাধন-ভজন করবে, তারা না খেলেই ভাল। রাত্রিতে কম খাওয়াও তাদের সঙ্গত।"

অ- —"আমরা মাছ খেতে পারি ত ?"

মহাপুরুষজী—"তা মাছ খাবে বই কি।"

অ- —"স্বামীজীর 'রাজযোগে' পড়েছি—যারা সাধন-ভজন করবে, তারা একদম নিরামিষ খাবে।"

মহাপুরুষজী—"যারা সাধন-ভজন করবে তাদের ডিম মাংস এ সব গুরুপাক জিনিস খাওয়া উচিত নয়।"

অ- —"আমরা ওসব ছেড়ে দিয়েছি।"

মহাপুরুষজী—"বেশ করেছ।"

অ- —"আচ্ছা মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'মা, যারা এখানে আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়।' 'লীলাপ্রসঙ্গে'ও

পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখেছেন—'যাদের শেষ জন্ম, তারাই কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসবে।' এই সব কথার মানে কি?"

মহাপুরুষজী—"মানে আর কি। যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করেছে, তাঁর নাম স্মরণ-মনন করছে, তাদের শেষ জন্ম। এতে আর সন্দেহ কি?"

অ- —"মহারাজ, ধর্ম্মজগতে কেন এমন হয়? কোন সময় বেশ ভাব-ভক্তি হলো, আবার কোন সময়ে তেমন ভাব-ভক্তি আসে না—এর দ্বারা কি মনে হয় যে সে নীচে নেমে যাচ্ছে?"

মহাপুরুষজী—"না। স্বামীজী বলতেন, 'Waves fall to rise higher (ঢেউ নীচে নামে আরও জোরে উঠবে বলে)।' যখন নীচে এরকম নামবে তখন নিশ্চিত এরূপ বিশ্বাস রেখো যে শীগ্‌গিরই আরও উঁচুতে, আরও জোরে waves (ঢেউ) আসবে।"

অ- —"মহারাজ, ভয় হয় পাছে কখন নীচে নেমে যাই।"

মহাপুরুষজী—"না, না, নীচে তোমরা কখনো নামবে না। তোমাদের কোন ভয় নেই। সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ধর্ম্মজগতের কথায় বলছ এরকম নামে ওঠে; কিন্তু সব জগতেই এই নিয়ম।"

অ- —"আপনাদের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত যেন ঠিক থাকতে পারি।"

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছ, শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকাই বাহাদুরি তা তোমরা ঠিক থাকবে।"

অ- —"ঠাকুর নিজগুণে আমাদের কৃপা করেছেন। তা না হলে পনর-ষোল বছর বয়সে ধর্ম্মের জন্য আমাদের প্রাণ তো আর ফেটে যাচ্ছিল না। তিনিই কৃপা করে টেনে এনেছিলেন। এখন তিনি

কৃপা করে রক্ষা করেন, তবেই হয়। মনে হয় খুব সাধন-ভজন করি, তাঁকে খুব ডাকি, কারণ সাধন-ভজন করলে মনে বেশ শান্তি পাই।"

মহাপুরুষজী—"তা বই কি? সাধন-ভজন করতে পারা মহা ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলবে—'ঠাকুর, আমরা মানুষ, আমাদের এত শক্তি কোথায় যে সাধন-ভজন করে তোমাকে পাব? তবে তুমি কৃপা করে আমাকে দেখা দাও।'"

অ-—"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলুম যেন কলকাতায় থাকতে পারি। তা হলে মঠে আসা ও আপনাদের দর্শনাদি করার সুবিধা হবে। তা ঠাকুর কৃপা করে সে যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তাই তো মাঝে মাঝে মঠে এসে ঠাকুর দর্শন ও আপনাদের দর্শন করতে পারছি। এতে আমাদের কত মঙ্গল!"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, মঠে আসা, ঠাকুরদর্শন ও আমাদের কাছে আসা—এতে তোমাদের মঙ্গল হচ্ছে বই কি। কালীঘাটে আছ—গঙ্গাদর্শন, মা-কালীদর্শন, গদাধর আশ্রমে রোজ যাওয়া—এতে তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল হচ্ছে।"

* * *

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, শনিবার। বেলুড় মঠ। অদ্য বৈকাল প্রায় ৫টার সময় আমার এক আত্মীয়া, বেণু ও আমার একজন সহকর্ম্মী সহ মঠে উপস্থিত হইয়া প্রথমে একা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিলাম। পরে সঙ্গীদের লইয়া তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে বলিলাম, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের

সঙ্গে দেখা হলে স্বামীজীর ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। মহাপুরুষজী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তা বেশ। হ্যাঁ, সব কাজই করবে, আবার মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রসঙ্গও করবে। তাতে mind (মনটা) refreshed (সতেজ) হয়। এ বড় ভাল।" পরে বেণুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে education (শিক্ষা) পাচ্ছ, তা হল Godless education (ধর্ম্মসম্পর্কহীন শিক্ষা)। তা হলেও education (শিক্ষা) নিতেই হবে, না হলে খেতেই পাবে না। তা বাবা, শেখ; কিন্তু ভগবানকে স্মরণ-মনন করতে যেন ভুল না হয়। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটও কোন ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ—গীতাপাঠ, কি 'কথামৃত'-পাঠ নিত্যই করবে। মনুষ্যজীবনে এটা বড় দরকার। যেমন আহার, নিদ্রা ইত্যাদির প্রয়োজন, ভগবানকে ডাকাও তেমনি অপরিহার্য্য। অবশ্য এর ফল হয়ত হাতে হাতে পাবে না—যেমন অন্যান্য কাজে পাও, যেমন ক্ষুধা লাগলে খেলেই শান্তি, ঘুম পেলে ঘুমুলে শান্তি। এ ঠিক তেমনটা নয়, তবে ভগবানের নাম না করলে এ হৃদয় একদম শুকিয়ে যায়—পশুর মত হয়ে যায়। তাই সব কাজ করবে, সঙ্গে সঙ্গে একটু তাঁর নাম করবে। ব্রাহ্মণের ছেলে গায়ত্রী-জপ করবে। গায়ত্রী-জপ একান্ত দরকার। ওর মধ্যে মস্ত বড় জিনিস আছে। গায়ত্রী-জপ কর তো?"

অ-—"না মহারাজ, আগে সে বেশ গায়ত্রী-জপ করত; কিন্তু এই দুই বৎসর যাবৎ কিছু করে না।"

মহাপুরুষজী—"না বাবা, ওটা করো না। ব্রাহ্মণের ছেলে গায়ত্রী-জপ ছেড়ে দিয়েছো? গায়ত্রীর মানে জেনে নিও। তাহলে গায়ত্রী-জপ করতে আনন্দ পাবে।"

এই বলিয়া তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ অতি সুন্দর ভাবে বলিয়া দিলেন।*

অ- —"দেখুন মহারাজ, আমাদের পরিবারে সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত। বেণু যদি এসব দিকে না আসে তবে বড়ই দুঃখের বিষয়।"

মহাপুরুষজী—"তোমাদের সকলকেই জানি। তোমাদের ধর্ম্ম-ভাবের যখন tradition (ধারা) রয়েছে তখন এ-ই বা না করবে কেন?"

আমরা আরতি দর্শন করিবার জন্য মহারাজকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। মহাপুরুষজী আমার আত্মীয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বদা ঠাকুরকে ডাকবে, তবেই শান্তি। কেবল দীক্ষা নিলে কি হবে? যদি না ডাক তবে কিছুই ফল পাবে না, আর যদি নাম কর তবে দেখবে কেমন শান্তি পাবে।"

পরে য- আসিয়া প্রণাম করিল। সে বলিল, "মহারাজ, অনেক দূরে থাকি, সর্ব্বদা আসতে পারি না, আপনি কৃপা করবেন।"

মহাপুরুষজী—"তা বাবা, যেখানেই থাক ঠাকুরকে ভুলো না। ঠাকুরকে ডাকবে, তিনি রক্ষা করবেন। কাজের মধ্যেও তাঁকে ভুলবে না।"

য- —"তিনি যেন আমাদের জোর করে করিয়ে নেন।"

---

* ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোকরূপে অবস্থিত)। তৎ (সেই) সবিতুঃ (সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রেরণকর্ত্তা) দেবস্য (দেবতার—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের) বরেণ্যং (ভজনীয়, শ্রেষ্ঠ), ভর্গঃ (তেজকে) ধীমহি (আমরা ধ্যান করি); যঃ (যে সবিতা দেবতা) নঃ ধিয়ঃ (আমাদের বুদ্ধি অথবা কর্ম্মকে) প্রচোদয়াৎ (কল্যাণের পথে প্রেরণ করুন)। অর্থাৎ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোকরূপে অবস্থিত, জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা জ্যোতির্ম্ময় দেবতার শ্রেষ্ঠ তেজকে আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে কল্যাণের পথে প্রেরণ করুন।

মহাপুরুষজী—"নিশ্চয়ই করাবেন। তোমাদের ভয় কি? এবার জাত সাপে ধরেছে।"

অ- —"হ্যাঁ, মহারাজ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আমাদের ভক্তি থাকে, আর যেন তিনি আমাদের রক্ষা করেন।"

মহাপুরুষজী—"নিশ্চয়ই তিনি রক্ষা করবেন তোমাদের—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

* * *

২৪শে অক্টোবর, ১৯২৮। আজ বিজয়া দশমী। বেলা প্রায় ১১টার সময় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া প্রণাম করিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "এবার প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েছে। বিসর্জ্জন দিতে মায়া হচ্ছে।" পরে তিনি যুক্তকরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমাদের সকলের মঙ্গল কর, সকলকে শান্তি দাও, জগতের মঙ্গল কর, মা।" পূ-বাবুর কথা তুলিয়া বলিলেন, "তার টাকা পেয়েই তো এবার মার পূজা করতে সাহস পেলুম। সে একটা মোটা টাকা দিলে, তাই মনে সাহস হল। কম টাকার দরকার নয় তো? এমন পূজা কোথায় হবে? এ যে ঠাকুরের বাঁধা আসর। এখানে মা আসবেনই। আহা! গত বছর মার পূজা হল না। গত বছর আমাদের বড় দুর্ব্বৎসর গেছে। শরৎ মহারাজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।" পরে অনেকে আসিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিলেন। তিনিও চক্ষু বুজিয়া আবেগভরে বলিলেন, "মা, সকলের মঙ্গল কর, সকলকে শান্তি দাও।"

* * *

১১ই নভেম্বর, ১৯২৮। ৺কালীপূজা। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার সময়ে নৌকাযোগে মঠে পৌঁছিলাম। মহাপুরুষজী উত্তরের ছাদে চেয়ারে বসিয়াছিলেন। একটি ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি প্রাণায়াম করিবেন কি না। তাহাতে মহারাজ বলিলেন, "তা তোমার ইচ্ছা। সহজ প্রাণায়াম করতে পার—যথা, breathing exercise (শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম), তাতে কোন ক্ষতি হবে না।" পরে অন্যান্য প্রসঙ্গ হইল।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীকালীপূজা দেখিতে নীচে নামিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় মহাপুরুষজীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল—মুখে কোন কথা নাই, কি যেন এক গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন! ভাষায় সে ভাব প্রকাশ করা অসাধ্য। রাত্রি প্রায় ১টার সময় উপরে উঠিলেন। তখন তাঁহার এমন ভাবতন্ময় অবস্থা যে পদক্ষেপের স্থিরতা নাই—নিজে যেন চলিতে পারিতেছেন না—সেবক তাঁহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে পূজামণ্ডপে যে গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীকে দর্শন করিতে তাঁহার ঘরে যাইলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মা-ভবতারিণীর কথা বলিলেন, "দেখ; ঠাকুর আমাদের বলতেন, 'যা মাকে গিয়ে বল্। যা চাইবি তাই পাবি।' ঐ মা-কালীই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরকে আশ্রয় করে এত লীলা করলেন। স্বামীজীকেও তিনি মা-কালীর কাছে পাঠিয়ে বললেন, 'মাকে গিয়ে বল্, তবেই অর্থাভাব থাকবে না।' স্বামীজীও

গেলেন, কিন্তু তিনি মাকে দেখেই বিহ্বল। এসব কিছু চাইতে পারলেন না। তিনি চাইলেন জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য। হ্যাঁ, ঐ দক্ষিণেশ্বরের কালী যে-সে নন। কাল আমাদের মঠে বেশ পূজা হলো। এমন পূজা তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না। এ তো আর ভট্টচার্জির পূজা নয়? ত্যাগী সাধুরা ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে মাকে পূজা করছে, ডাকছে। এমন পূজা কোথায় পাবে? এখানকার ভাবই অন্য রকম। এবার তোমরা যাও মার প্রসাদ পাও গিয়ে।" সকলেই প্রণাম করিয়া নীচে প্রসাদ পাইতে গেলাম।

* * *

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮, শনিবার। বেলুড় মঠ। বৈকালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরের ছাদে যাইয়া বসিলেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন। সু-বাবু যাইতেই যো-বাবুর সম্বন্ধে কথা হইল।

মহাপুরুষজী—"এমন জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত বড় দুর্লভ।"

সু-বাবু—"তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কিছুই খান নাই এবং সকলকে বল্লেন, 'তোমরা আর আমাকে কোন প্রকারে disturb (বিরক্ত) করো না। আমি আমার ঘর চিনে নিয়েছি। এখন আস্তে আস্তে মরতে দাও। আর কোন ভয়-ভাবনা আমার নেই।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, ঠিক। তিনি ঠিক তাঁর ঘর চিনে নিয়েছেন।"

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?"

তিনি বলিলেন—"শরীর ভাল নেই, heart (হৃদ্‌যন্ত্র) খারাপ। (হাসিতে হাসিতে) any moment-এ (যে-কোন মুহূর্ত্তে) এই দেহ চলে যেতে পারে। তার জন্যে ভাবি না। আমরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের

জায়গা চিনে নিয়েছি এবং জীবনের কি mystery (রহস্য), তাও তিনি কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

তারপর অন্যান্য প্রসঙ্গ হইল—দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে। এবার ঠাণ্ডা পড়িতে তিনি পূর্ব্বের বারান্দায় আসিলেন এবং স্থ-বাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মন্দির-পরিচালনা সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলমাল শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "মার যে রকম ইচ্ছা, হবে ; কিন্তু আমাদের মনে হয় এত শীঘ্র এ জায়গা নষ্ট হবে না।"

* * *

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি। বৈকাল ৫টার পর। ভবানীপুরের স্থ-বাবু দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে কথা তুলিলেন।

মহাপুরুষজী—"আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থান। এ নষ্ট হবার নয়, কত লোকের উপকার হচ্ছে।"

স্থ-বাবু—"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কি খুব জঙ্গল ছিল ?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, পঞ্চবটী পর্য্যন্ত জঙ্গল ছিল।"

স্থ-বাবু—"ঠাকুর কি লেখাপড়া একটু একটু জানতেন ?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই যে তাঁর নাম সহি আছে। (তাঁহার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-স্বাক্ষরের ফটো বাঁধানো ছিল, তাহা দেখিতে বলিলেন)। ঠাকুরের হাতের রামায়ণ লেখা আছে। সেই

copy (পাণ্ডুলিপি) খানা আমাদের এখানে আছে। আর একখানা বই-এর ভিতর তাঁর হাতের লেখার copy আছে।”

স্থ-বাবু—“আপনি কি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি দেখেছেন ?”

মহাপুরুষজী—“হ্যাঁ, অনেকদিন পূর্ব্বে তাঁর জন্মভূমি দেখতে গিয়েছিলুম।”

স্থ-বাবু—“সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির হবার কথা ছিল। তার কি হলো মহারাজ ?”

মহাপুরুষজী—“হ্যাঁ, কথা হয়েছে বটে। তবে এখনও fund-এর (টাকার) জন্য appeal (আবেদন) বাহির হয় নাই।”

স্থ-বাবু—“আপনার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আমাদের আর কি কিছু হবে ?”

মহাপুরুষজী—“এই শরীর যাবেই। চিরদিন স্থূল শরীর কখনও থাকেও নি, থাকবেও না। ওর জন্য তোমরা ব্যস্ত কেন ? শ্রীশ্রীঠাকুর রয়েছেন, চিরদিনই থাকবেন। আমার এই শরীরের জন্য ভেব না, বাবা। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোমরা খুব প্রাণভরে ডেকে যাও দেখি, তাতে খুব মন বসে যাক দেখি, তাঁর ভাবে মনটা মাতিয়ে ডুবে যাও দেখি। সেটিই হলো আসল কথা। তা যদি না হয়, তবে কিছুই হলো না। আমার এই শরীরের জন্য ভেব না। তোমরা ঠাকুরকে দেখ নি ; তা না-ই বা দেখলে ? আমাদের তো দেখছো ? তিনি আমাদের ভিতর তাঁর spirit (সূক্ষ্মশক্তি) রেখে গেছেন। এই spirit-টা realise (অনুভব) করতে চেষ্টা কর। তা না হলে কি হবে ? তা না হলে তোমরা কি সাধারণ সংসারী লোকদের মত যেমন মা-বাপ মারা গেলে কাঁদে—আমাদের কি হবে বলে হাহাকার

করে, সেই রকম করবে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের মায়িক সম্বন্ধ নয়। তোমাদের সঙ্গে আমাদের spiritual relation (আধ্যাত্মিক সম্পর্ক)। এই relation (সম্পর্ক) অচ্ছেদ্য। কখনও এ সম্বন্ধ যাবে না—যেতে পারে না। তুমি যে কথা বলছ, 'আমাদের দেহ গেলে কি করবে', এ তো অতি মোটা বুদ্ধির কথা। আমার শরীর যায় যাক্। তোমরা আমার spirit (ভাব)-টা নাও। তবে তো হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে, বাবা, একেবারে ডুবে যাও। মনটা প্রথম ঠিক হোক, তারপরে সব হবে। মন যদি তাঁতে ডুবে না যায়, তবে এখানে এলেই বা কি হবে? সর্ব্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর—'হে ঠাকুর, তুমি এ যুগের অবতার, জগদ্‌গুরু, মানবের কল্যাণের জন্য এ ধরাধামে এসেছ। তুমি আমাদের চৈতন্য দাও; অচল, অটল বিশ্বাস দাও—সেই বিশ্বাস যেন কখনো না টলে, তোমার শ্রীচরণে যেন অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস থাকে।'—এই বলে খুব প্রার্থনা করবে। প্রথমে জীবন তৈরী হোক। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর যে চৈতন্য রয়েছে সেই চৈতন্যই আমার মধ্যে আছে। তাঁকেই আপনার করে ফেল। তাঁতে খুব ডুবে যাও। মন স্থির হয়ে যাক।"

এই কথাগুলি মহাপুরুষজী খুব inspired (অনুপ্রাণিত) হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতি হইতেছিল। কিছুক্ষণ বাদে আবার আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা আমাদের আপনার লোক, তাই তোমাদের এত সব কথা বললুম। যা বললুম, এর নামই পাকা ভক্তি, পাকা জ্ঞান। তোমরা আমাদের খুব আপনার লোক। মনে রেখো, এর চেয়ে আলাদা আমাদের আর কিছু কথা নেই।"

তাঁহার মুখে এই সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। অতঃপর তিনি শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরাও কিছুক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিয়া বিদায় লইবার জন্য প্রণাম করিলাম। তিনিও স্নেহভরে 'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিলেন। আমরা তাঁহার এই অহেতুক কৃপা ও অমূল্য উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম।

* * *

১১ই জুন, ১৯২৯। বেলুড় মঠ। পূজনীয় মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। তখন তিনি একটি যুবক ভক্তকে উপদেশ দিতেছিলেন—"গুরু আর ইষ্ট এক। এঁকে ভাবলেই ওঁকে ভাবা হল। Separate (পৃথক)ও বটে, separate (পৃথক) নাও বটে। দেখতে separate (পৃথক) হতে পারে।"

জনৈকা মহিলা-ভক্তের প্রসঙ্গ উঠিল।

মহাপুরুষজী—"দেখ অ-, মেয়েদের ধর্ম্ম বেশ শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়। ওদের যদি একটা ভাব দেওয়া যায় তবে ওরা সেটা খুব নিষ্ঠার সহিত করে থাকে। তোমাদের মত reason (বিচার) করে না। বাস্তবিক ভগবানকে ভালবাসার মত হৃদয় মেয়েদেরই আছে।"

অ-—"আমার বৌদি সর্ব্বদাই দুঃখ করেন যে তিনি আপনাকে এসে দর্শন করিতে পারেন না। আমি বলেছি, 'দেখুন, আপনি যে এখানে বসে তাঁর স্মরণ-মনন করছেন, এতেই তাঁকে দর্শন করার কাজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সর্ব্বদাই তাঁকে দেখছি, তাতে কিই বা আর হচ্ছে?'"

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছো। তারা যেখানেই থাকুক না, যদি আমাদের বাস্তবিক স্মরণ-মনন করে, তবে আমরা তাদের নিকটেই

আছি। মন নিয়ে কথা। মনের কাছে দূর নিকট নাই। কেউ যদি একটা ভাব নিয়ে আমাদের চিন্তা করে, তবে তাদের মঙ্গলই হবে। এতে আর সন্দেহ কি? নিকট বা দূর তাতে কিছুই যায় আসে না।"

* * *

৬ই জুলাই, ১৯২৯। অদ্য আমি, স্থ-বাবু ও কু-বাবু একসঙ্গে মঠে পৌঁছিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীকে প্রণাম করিলাম। তিনিও আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থ-বাবু প্রণাম করিলে মহাপুরুষজী বলিলেন, "কি স্থ-, তোমার মার চিঠি পেলুম, তুমি নাকি সংসারত্যাগ করবে! তোমার বৃদ্ধা মাকে কে দেখবে তা হ'লে?"

এমন সময় মঠের কয়েকজন সাধু ঘরে ঢুকিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আবার মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম।

স্থ-বাবু—"আমি সংসারত্যাগ করলে তাতে মার কোন কষ্ট হবে না, মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"তোমাকে কি আর আমি দেখছি না? তবে বুড়ো মা, তাঁর কষ্ট হবে; তিনি যে সব আমার উপর নির্ভর করছেন।"

স্থ-বাবু—"মা তো স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে আপনাকে এই সব কথা লিখেছেন, কিন্তু এখন যদি আমি বেরিয়ে পড়তে না পারি তবে আর কোন কালেও পারবো না। সম্পূর্ণ সুযোগ কখনো হবে না।"

মহাপুরুষজী—"সংসারত্যাগ করা ভাল, কিন্তু লোকে এই বাহ্যিক ত্যাগকেই ত্যাগ মনে করে। কাকে পাবার জন্য যে ত্যাগ করে

এলুম তা আর ভাবে না। উদ্দেশ্য ভুলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায়। তবে একটা লাভ আছে, এই সব association-এ (সঙ্ঘে) এলে মানুষ ভালর দিকেই যায়।"

সু-বাবু—"এতকাল আপনাদের কাছে এসে সংসারত্যাগ করব—এই সব inspiration (প্রেরণা) পেয়েছি। আপনারও এই বৃদ্ধ শরীর, আর কতদিনই বা আপনার দেহ থাকবে ঠিক নেই। নিজেও বিবাহ করি নি। এই সব ideas (ভাব) আপনারা দিয়েছেন, তাই বেরিয়ে পড়তে চাই।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন আর আমি নিষেধ করি না। তবে দেখ সু-, সংসারত্যাগ করা ভাল, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যাতে ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি বাড়ে, এটি দেখতে হবে। তা না হলে কিছুই হবে না এ সব বাহ্যিক ত্যাগে। ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসই আসল কথা। তুমি কোথায় যাবে মনে করেছ ?"

সু- —"হরিদ্বারে থাকব, পূজনীয় কল্যাণ স্বামীজীও সম্মত হয়েছেন।"

মহাপুরুষজী—"সেখানকার কাজকর্ম সব করে উঠতে পারবে তো ?"

সু- —"কেন পারব না ? আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে সব পারব।"

মহাপুরুষজী—"তা বেশ।"

কতক্ষণ পরে সু-বাবু আবার বলিলেন, "মহারাজ, আপনার একজিমাগুলি বেড়েছে দেখছি।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ। (সেবককে বলিলেন) ম-, দাও তো

তেলটা।" ম- মহারাজ মহাপুরুষজীর পায়ে তেলমালিশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপুরুষজী (হাসিতে হাসিতে)—"এই ছেলেগুলি আমার কতই না সেবা করছে! শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তি-বিশ্বাস দিয়ে এদের পূর্ণ করে দিন। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ অ-, তুমি কিন্তু সংসারত্যাগ করো না। তোমার বুড়ো মার কিন্তু আর কোন অবলম্বন নাই। তুমি টাকাটা পাঠাবে তবে তিনি খেতে পাবেন।"

অ- —"মহারাজ, আমার সংসারত্যাগ করবার মত সুযোগও নাই। যদি থাকতো তবে কি আমি থাকতুম?"

* * *

১৭ই আগষ্ট, ১৯২৯, শনিবার। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ মঠবাড়ীর পূর্ব্বদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। আট-দশ জন ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনিও একে একে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। একটি ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?"

মহাপুরুষজী—"শরীর আমার ভাল নেই, এই বুড়ো শরীর আর ভাল থাকে না। সব ব্যারামই আছে ও থাকবে। তা শরীর যেমনই থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। আমাদের উপদেশ তোমাদের প্রতি—এ জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরই সত্য, তিনি সকলের ভিতরে রয়েছেন। তিনি অবতার। তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন, তাঁকেই কেবল সত্য বলে জানবে। আর তাঁর নাম-গুণ গান করবে। হাঁ, সংসারে তোমরা রয়েছ; দেখো, যেন তাঁকে ভুলো না, তাঁকে ভুললে সবই ভুল হয়ে যাবে। এখানকার কিছুই সত্য নয়, তবে যখন সংসারে রয়েছ, সংসার করবে বইকি। এ সংসারে থেকেও তাঁকে

যেন ভুল না হয়। সবই করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্মরণ-মনন করবে—এই আমার অনুরোধ।"

কথাগুলি এমন ভাবের সহিত বলিলেন যে, শুনিয়া সকলেই একেবারে নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনিও ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে অ- বলিলেন—"আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ছবিখানা পূজা করি তা আট-দশ বছর হয়েছে, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কি করব তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

মহাপুরুষজী—"নূতন একখানা এনে পূজা করবে।"

অ- —"পুরানো ছবি কি করব? এতকাল ঐ ছবিখানা পূজা করছি। একটা মায়া হয়েছে—কত প্রার্থনা করেছি।"

মহাপুরুষজী (হাসিতে হাসিতে)—"তা হবে বইকি। তা ও-খানাও রাখবে, দু'-একটা ফুলও দেবে।"

অ- —"হ্যাঁ মহারাজ, তাই করব। দেখুন মহারাজ, কি আশ্চর্য্য! আমাদের নিকট কিন্তু ছবি বলে কখনো মনে হয়না।"

মহাপুরুষজী—"এই তো আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

অ- —"আমার মনে হয় হিন্দুরা কখনো সাকার উপাসনা না করে থাকতে পারে না।"

মহাপুরুষজী (খুব খুশী হইয়া)—"তুমি যা বলেছ তা খুব ঠিক। হিন্দুরা কখনো এই সাকার উপাসনা না করে থাকতে পারে না।"

অ- —"এটা যেন তাদের জন্মগত সংস্কার।"

মহাপুরুষজী—"বিশেষতঃ হিন্দুদের।"

অ- —"পূজাতে খুব আনন্দ পাই। পূজাই প্রথম। পূজা করলে মনে কেমন আনন্দ হয়, কখনো মনে হয় না যে ছবি পূজা করছি।"

মহাপুরুষজী—"কারণ spirit (সূক্ষ্মভাব) যে তাঁর রয়েছে। আমাদের ঠাকুর পূজাই তো প্রথম করলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ-বেশে এলেন।"

অ- —"নিরাকার কিন্তু আমাদের মনে স্থান পায় না—ধারণা আমরা করতে পারি না।"

মহাপুরুষজী—"তা ঠিক; তবে তিনি নিরাকারও বটেন। তা তিনি যখন দরকার হয় বুঝিয়ে দেবেন। তিনি যদি কৃপা করে সত্যকে প্রকাশ করেন, তবেই ভক্ত বুঝতে পারে যে সবই ঠিক। বিশ্বাস-ভক্তি পাকা হলেই সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষকে জানতে পারা যায়। তখন দেখতে পায়—তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার।"

অ- —"মহারাজ, আপনারাও আমাদের কৃপা করে খুব ভালবাসেন। আপনারা কৃপা করেন বলেই আমাদের মন সর্ব্বদা আপনাদের কথা ভাবে। কৃপা করে বলে দিন, কি করলে এই সংসারবন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যায়।"

মহাপুরুষজী—"তা তোমাদের উপর আমাদের সততই ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ রয়েছে। এতে আর সন্দেহ কি? তবে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য ভেবো না। প্রকৃত ভক্ত অন্য কিছুরই কামনা রাখবে না। তার যা কর্ত্তব্য আছে সে তা করবে। আর বেরাল-ছানার মত মার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এই হলো ভক্তের লক্ষণ। ভক্ত আর কিছুই চাইবে না। মা যখন যেমন রাখেন তাই মঞ্জুর করে

নেবে। (সেবকের প্রতি) শ-, এবার আমায় একটু প্রসাদ খেতে দাও।”

কথাপ্রসঙ্গে অ- বলিলেন—“মহারাজ, ডাকা ও প্রার্থনা দুই-ই করব তো?”

মহাপুরুষজী—“হ্যাঁ বাবা, কখনো বা জপ, কখনো প্রার্থনা—এই ভাবে করবে।”

অ- —“আপনি আমাকে বলেছিলেন সর্ব্বদা জপ করতে। তা কিন্তু এখনো আমার অভ্যাস হয় নাই। মহারাজ, যখন স্মরণ হয় তখন মনে মনে জপ করি, কিন্তু আফিসের সময় পারি না।”

মহাপুরুষজী—“তা কি করে পারবে? একসময়ে দুই কাজ হয় না। তাতে কাজে ভুল হবে। যখন সুবিধা হবে তখনই করবে। তোমাদের উপর আমাদের টান রয়েছে। ভয় কি?”

*　　　*　　　*

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, শনিবার। বেলুড় মঠ। অদ্য বেলা ৩-৩০ মিঃ সময় মঠে পৌঁছিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিলাম। ঘরে কেহই ছিলেন না। মহারাজজী একখানা বই পড়িতেছিলেন, কতক্ষণ পরে বইপড়া শেষ করিয়া উঠিলেন এবং বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। প- ও কা- মহারাজের সঙ্গে মঠ-মিশনের কাজ-কর্ম্মের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মহাপুরুষ মহারাজ—“মায়ের বাড়ী এখন ঠিকভাবে চলছে। কি অবস্থাই না হয়েছিল! শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষের ভেতরটা কৃপা করে যদি বদলে দেন তবেই মঙ্গল। ভেতর থেকে অবস্থা না বদলালে কিছুই হবার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের চৈতন্য করে দিন, সকলে সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক—আমাদের এখন এই একমাত্র কামনা। আমরা কখনো পরের অনিষ্ট চিন্তা করি না। কেন করবো? সেটি বড় অন্যায়। ভাল মন্দ তিনিই সব দেখছেন। আমরা শুধু প্রার্থনা করবো—'ভগবান, মানুষকে সদ্‌বুদ্ধি, সৎসাহস দাও।' ”

* * *

৫ই অক্টোবর, ১৯২৯। বেলুড় মঠ। আরতির পরে মহাপুরুষজী উপরের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসিয়া দী-বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষজী—"তুমি আবার মানুষকে কি মন্ত্র দেবে? তুমি এম.এ. পাশ করে এখন চাকুরি করছ। তুমি এই অবস্থায় কি করে মানুষকে মন্ত্র দেবে? হ্যাঁ, সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে যদি সাধন-ভজন করে নিজে তৈরী হতে পার তবে দেওয়া চলে। গুরু হওয়া সহজ কথা নাকি? আমি তো ভেবেই ঠিক করতে পারি না যে কি করে তুমি মন্ত্র দেবে? তোমারই ঈশ্বরলাভ হলো না, কি করে আর একজনকে ঈশ্বরলাভের পথ দেখাবে? এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাও তোমার ধৃষ্টতা। তোমার বাবা জ্যেঠা এ কাজ পুরুষানুক্রমে করে গেছেন, তাই তাঁরা মন্ত্র দিতে পেরেছেন। তাঁদের এই ব্যবসা ছিল—মন্ত্র দেওয়া। আজকাল এ জন্যই লোকের ভগবানলাভ হয় না। আমি কিন্তু তোমার মন্ত্র দেওয়া ভাল মনে করি না।"

দী-বাবু—"আমাদের শিষ্যগণ আমাকে বড্ড ধরেছে মন্ত্র দেবার জন্য। তাদের মধ্যে একজন বেশ ভাল লোক আছে। আমার ইচ্ছা আপনার কৃপা পা'ক, অন্য কেহ আসবে না।"

মহাপুরুষজী—"সে যদি আসে ভালই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব পেয়ে যাবে। ধন্য হয়ে যাবে সন্দেহ নাই। দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সকলে নিতে পারে না।"

দী-বাবু—"দেখুন মহারাজ, আমি যদি দীক্ষা তাদের না দেই তবে তারা আমাদের উল্টে অনিষ্ট করতে চেষ্টা করবে।"

মহাপুরুষজী—"সে কি? তুমি দীক্ষা সম্বন্ধে কিছু জান না। তুমি কি করে দীক্ষা দেবে? আর তাদেরই বা কি উন্নতি হবে? তুমি যদি বাস্তবিক সরল হও, কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। তাদের বেশ করে বুঝিয়ে বলবে—'দেখ, আমি কিছুই জানি না। এ অবস্থায় মন্ত্র দিলে তোমাদের কিছু উন্নতি হবে না। হ্যাঁ, তবে তোমরা যদি মন্ত্রকে চৈতন্য করে নিতে পার, তবে নাও।' গুরুগিরি করা বড় শক্ত ব্যাপার। তবে এখন করছে অনেক লোক।"

অ- —"দেখুন মহারাজ, আমার মনে হয় লোকের যেরূপ মন গুরুও তার তেমনি জোটে। এখন কি আর মানুষ ভগবানলাভ করতে হবে—এই বিচার করে দীক্ষা নেয়? সব রকম সংস্কার আছে, এটিও একটি সংস্কার মাত্র। গৃহস্থলোকে বলে, 'বয়স তো হলো, দীক্ষাটা এখনও নেওয়া হলো না। কবে মরে যাব, মন্ত্রটা তাই শীঘ্র শীঘ্র নিতে হয়।' যেমন সংস্কার, মনও তেমনি হয়।"

মহাপুরুষজী (সহাস্যে)—"ঠিক বলেছ, লোকে এভাবেই এখন দীক্ষাদি নিয়ে থাকে বটে।"

উপস্থিত এক ভদ্রলোক বলিলেন—"মহারাজ, এতে কি লোকের মঙ্গল হয় না?"

মহাপুরুষজী—"মঙ্গল কি করে হবে? সাধন-ভজন না করে কি কেউ কখনো ভগবানকে পেয়েছে, শুনেছ? গুরু তো মন্ত্র দিয়ে খালাস। এখন তোমায় সেই ইষ্টমন্ত্রে শ্রদ্ধাশীল হয়ে জপ-ধ্যান করে ভগবান লাভ করতে হবে। নচেৎ উপায় কি?"

এবার একে একে সকলে মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

*　　　*　　　*

৩রা নভেম্বর, ১৯২৯। বেলুড় মঠ। প্রাতে প্রায় ৮-১৫ মিঃ-এর সময় দিদিকে ও শ্রীমান্ শ-কে লইয়া মঠে পৌঁছিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে একে একে প্রণাম করিলাম। মহাপুরুষজী দিদিকে বলিলেন—"মা, ভগবানই সত্য, তাঁকে ভুলো না।" এবার শ-গায়ত্রী-জপ করে কি-না সে বিষয়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ-অসুখের পর থেকে গায়ত্রী-জপ করে না শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "সে কি? ব্রাহ্মণের ছেলে গায়ত্রী-জপ করবি না কেন? রোজ গায়ত্রী-জপ করবি। গায়ত্রীর অর্থও জেনে নিবি। গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের মস্ত উপাসনা।" বলিতে বলিতে করুণায় বিগলিত হইয়া অযাচিতভাবে তখনই শ-কে মহামন্ত্র প্রদান করিলেন ও হাতে একটি বেদানা দিয়া বলিলেন, "যা, তুই খেতে খেতে চলে যা, আমি দেখি।" আমাদেরও মঠে প্রসাদ পাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু আমরা দক্ষিণেশ্বর যাইব শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—"তবে আর দেরি করো না, বেলা হয়ে গেল।" আমি বলিলাম—"চমৎকার ব্যাপার হলো কিন্তু। আপনার শ্রীচরণদর্শন করতে এরা এলো, তা দর্শন তো হ'লই, তা ছাড়া ছেলেটি আপনার কৃপা পেয়ে

গেল। কোথায় সে আপনাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ফল দেবে, তা না হয়ে উল্টো আপনিই তাকে বেদানা খেতে দিলেন।"

আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণবন্দনা করিয়া তাঁহার এই অহেতুক কৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওনা হইলাম।

* * *

৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৯। বেলুড় মঠ। বৈকাল ৪-৩০ মিঃ সময় আমি ও কু-বাবু একসঙ্গে মঠে পৌঁছিলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহার নিকট চুপচাপ বসিয়া আছি, এমন সময় প্রি- মহারাজ আসিয়া জানাইলেন, "ক্যাপ্টেন নাগ-এর ভগ্নী আসিয়াছেন।" মহারাজজী বলিলেন, "নিয়ে এস।" আমাদিগকে একটু বাহিরে যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। আমরা পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া আছি, তাঁহাদের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইলাম। মাতৃজাতির উন্নতি ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে মহারাজজী প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া প্রাণের আবেগে কত কথাই বলিলেন। মাতৃজাতির কল্যাণ-কামনায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বলিলেন—"ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার উপরই নির্ভর করছে; মেয়েরা না জাগলে এদেশের কোনমতেই উদ্ধার নেই।" উক্ত মহিলাটি বলিলেন—"আমার মনে হয় মেয়েদের জন্য একটা আশ্রম হওয়া উচিত, সেখানে থেকে তারা চরিত্রগঠন করবে ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা, ধর্ম্ম, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করবে। লৌকিক বিদ্যা ও গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চ্চা হবে। এভাবে

ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে যদি মেয়েরা শিক্ষালাভ করে তবেই নারী-সমাজের উন্নতি হতে পারে।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, এ তোমার বেশ idea (ভাব)। এতে মেয়েদের ও জগতের কল্যাণই হবে। সকলেই যদি এরকম দেশের জন্য ভাবে তবেই তো দেশের যথার্থ কল্যাণ হয়। আমার মনে হয় কি জান মা, ভিতর হতে একটা change (পরিবর্ত্তন) না এলে কেবল individual (ব্যক্তিগত) চিন্তায় বিশেষ কোন ফল হবে না। মহামায়া যদি একটা change (পরিবর্ত্তন) এনে দেন তবেই হবে। Individual (ব্যক্তিগত) চিন্তায় উপকার আছে বটে, তাতে অন্ততঃ নিজেরও উন্নতি হয়। সততই আমাদের প্রাণে কি ইচ্ছা হয় জান মা, এদেশের মেয়েরা সব জেগে উঠুক, মা জগদম্বা তাদের অন্তরে ভক্তি-বিশ্বাস দিন, মহামায়া পাশ কেটে দিন।"

ভদ্রমহিলা মহাপুরুষজীর মুখে এইরূপ সারগর্ভ বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * *

২রা ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৩০। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষজীর ঘরে রবিবার বলিয়া আজ একটু ভিড় বেশী। কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। আমরা বৈকাল ৪-৩০ মিঃ সময় তাঁহার শ্রীচরণবন্দনা করিয়া সেইখানেই বসিলাম। নানাপ্রকার প্রসঙ্গ হইতেছে।

জনৈক ভক্ত—"মহারাজ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের আত্মার যেন উন্নতি হয়।"

মহাপুরুষজী সুপ্রসন্ন, হাত তুলিয়া উপস্থিত ভক্তদের আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন—"তোমাদের আত্মার কল্যাণ হোক।"

এই অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ভক্তবৃন্দ কৃতার্থ হইলেন। এই আত্মার কথা বলিতে বলিতে মহারাজজী যেন অন্য এক জগতে চলিয়া গেলেন। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, গম্ভীর, ধীর, স্থির—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"আত্মার উন্নতিই হচ্ছে আসল কাজ। তা ভিন্ন এ জগতের কাজ কিছুই নহে। অবশ্য যে স্রোত এসেছে তাতে সকলেই মুক্ত হবে। কিন্তু তা বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, individual (প্রত্যেক) আত্মার উন্নতির জন্য সাধন-ভজন করাও দরকার। তা না হলে কি হবে? শাস্ত্র তো দেখছ, তাতে কত কথাই আছে নিত্য অনিত্য সম্বন্ধে। কিন্তু তাতে নিজেদের কি হলো? তাই সাধন-ভজন করা দরকার। এই সংসার চিরকাল থাকবে না, তা যতই চেষ্টা করনা কেন। তাই বলছি আত্মার উন্নতির জন্য চেষ্টা কর।"

ভক্ত—"কি করে আত্মার উন্নতির চেষ্টা করা যায়, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী—"তাঁর নামকীর্ত্তন, সাধন-ভজন করা, সর্ব্বদা তাঁর স্মরণ-মনন করা—এই সব করে তাঁর প্রসন্নতা আনতে হবে। তিনি মায়া দ্বারা জগতকে ভুলিয়ে রেখেছেন। তাই সর্ব্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—'ভগবান, তোমার এই মায়ার জগতে আমাদের কিন্তু তুমি ডুবিয়ে রেখো না, তোমার ভুবনমোহিনী মায়াতে যেন মুগ্ধ না হই, আর তোমার পাদপদ্মে যেন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে। তোমার এই যে মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন। তুমি কৃপা করে আমাদের এই মায়ার বন্ধন কেটে দাও, তবেই তো তোমাকে আমরা পাব। তা না হলে—তুমি প্রসন্ন না হলে আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তিতে ও

সাধন-ভজন দ্বারা তোমাকে পাব না। তোমার কৃপা দ্বারাই তোমার এই মায়া হতে উদ্ধার হব।' এভাবে রোজ প্রার্থনা করতে হবে—তা না হলে উপায় কি? মনকে রোজ অভ্যাস দ্বারা বশীভূত করতে হবে। মন অবশ্য সহজে তাঁর চিন্তা করতে চাইবে না। তখন মনকে জোর করে টেনে ভগবানের দিকে লাগাতে হবে। এরকম অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে বড় মুশকিল। দেখ, তিনিই যখন সংসারে রেখেছেন, তখন থাকতেই হবে। প্রকৃতিই তোমাকে কর্ম্ম করিয়ে নেবে। তুমি কিছুতেই নিরোধ করতে পারবে না। সংসারের কাজ তো করতেই হবে; তবে তার মধ্যেও একটু সময় করে তাঁকে ডাকতে হবে। নচেৎ বড় মুশকিল, বড় বিপদ। তাঁর শরণাপন্ন না হয়ে সংসার করতে গেলে বড় বিপদ। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আর আঠার ভয় থাকে না।' এ কথা অতি সত্য। ভগবানকে ধরে—খুঁটি ধরে এই সংসারে ঘুরলে আর ভয় নেই, বিপদে হাহুতাশ করে সাধারণ লোকের মত মরতে হবে না। দেখ, সংসার বড়ই অশান্তির স্থান, এখানে প্রকৃত শান্তি আছে কি? তাই একটু সাধন-ভজন অবশ্যই করতে হবে। তা নইলে বড়ই বিপদের কথা জানবে। সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, পরস্পর সদালাপ—এসব করতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরস্পর দেখাশুনা হলে একটুও সদালাপ হয় না, কেবল politics (রাজনীতি) নিয়ে যত বাজে কথা কইবে। এসব চিন্তা (ভগবচ্চিন্তা) যেন একদম উঠে গেছে। National work (দেশের কাজ) ভাল। কে মন্দ বলছে? কিন্তু সেই কাজ করতে গেলেও আগে এসব সৎচিন্তা দ্বারা জীবনকে তৈরী করে নিয়ে—চরিত্রগঠন করে নিয়ে সেই কাজ করলে

তবে success (সফলতা) লাভ করা যায়। তোমরা এখানে আস, সাধুসঙ্গ কর, সদালাপ কর, তোমাদের উন্নতি হচ্ছে—এটাও যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত, যেমন নিজেরা সৎচিন্তা করলে, তাদেরও সেভাবে প্রেরণা দেওয়া। তারা in the dark (অন্ধকারে) রয়েছে, তাই joint family-তে (একান্নবর্ত্তী সংসারে) একটা সময় করে এসব সৎচিন্তা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। তোমরা এবিষয়ে খুব ভাববে। এসব কাজই হচ্ছে আসল কাজ, পরে সংসারের কাজ। সংসারে যখন ভগবান রেখেছেন তখন সংসারের কাজ তো করবেই, তার ভিতরেই সময় করে এসব কাজও করতে হবে ; তবে বাঁচোয়া, তা না হলে বড়ই মুশকিল।”

স- ভায়া জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ, স্বামীজী যে বলেছেন—‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥’ ”

মহাপুরুষজী—“হ্যাঁ, তিনি তো ঠিকই বলেছেন। আগে তোমরা তোমাদের নিজেদের সংসারের উন্নতি কর, পরে অন্যের কথা, তারপর গ্রামের উন্নতি কর, তবে তো হবে। Charity begins at home. পরে সকলের জন্য করবে।

* * *

৩রা মে, ১৯৩০। স্থান—বেলুড় মঠ। অ-বাবু—“মহারাজ, গত মাসের ‘উদ্বোধনে’ আপনার চিঠি বেরিয়েছে। তাতে আছে—ঠাকুরকে ভালবাসতে হবে, তাতেই সব হবে। এর মানে আমি বুঝতে পারলুম না।”

মহাপুরুষজী—“হ্যাঁ, ঠাকুরের উপর যদি ভালবাসা আসে তবেই

সব হল। ভালবাসা না আসা পর্য্যন্ত কি করে তোমরা তাঁকে পাবে? সেজন্যই তো বলছি, মন মুখ এক করে তাঁকে ডাক, তাঁকে ভালবাস।"

অ- —"পূজা, নাম-জপ তবে দরকার নাই?"

মহাপুরুষজী—"নিশ্চয়ই আছে, এসব আন্তরিক ভালবাসার সহিত করতে হবে। তবেই কাজ হবে। উপর উপর করলে কিছুই হবে না। ভালবাসাই তো তিনি চান। তাই ভালবাসা হলেই সব হল।"

অ- —"পুরানো 'উদ্বোধনে' পড়ছিলাম আপনি প্রাণায়াম সম্বন্ধে লিখেছিলেন।"

মহাপুরুষজী—"আরে, তখন কি লিখেছিলুম তা কি মনে আছে? তবে কাশীতে থাকতে লিখেছিলুম বটে। ধ্যান কিংবা জপ ঠিক ঠিক হলে কুম্ভক আপনিই হয়। তবে উদাহরণও দিয়েছিলুম যে, কোন এক ব্যক্তি খুব একমনে ভাল একখানা বই পড়ছেন, তখন তিনি ঐ বইখানা পড়ে এত স্থির (তন্ময়) হয়ে পড়েন যে, শেষ না করে উঠতে পারেন না, একেবারে মগ্ন হয়ে যান। বায়ু স্থির হয়ে যায়। জপ-ধ্যানেতে প্রাণায়াম আপনিই হয়। যদি কোন ব্যক্তি খুব দৃঢ়চিত্তে প্রাণের সহিত ভগবানের নাম করেন তবে তাঁর কুম্ভক আপনিই হয়।"

অ- —"প্রাণায়াম মানে কি মনকে concentrated (একাগ্র) করা?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, অনেকটা তাই।"

অ- —"মহারাজ, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হয়। তবে আর আমাদের প্রার্থনা করে লাভ কি?"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, তাঁর যা ইচ্ছা তা তো হবেই, তা বলে প্রার্থনা করতে বিরত হবে কেন? প্রার্থনা এক বড় সাধনা; প্রার্থনা করবে বই কি বাবা। প্রার্থনা অবশ্যই করবে।"

অ- —"তবে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, তাঁকে ডেকে যাওয়া; এতে ভাল ফল কি মন্দ ফল যাই আসুক—তা সহ্য করে যাওয়া, কারণ তাঁর যে কি ইচ্ছা আমিও জানতে পারি না। সম্পূর্ণ তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকা। আমার আমিত্ব একেবারে নাশ করে দিয়ে তাঁর উপর নির্ভর করা।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তুমি কি করে বুঝবে, তাঁর কি ইচ্ছা? হয়তো অমঙ্গল হল, মনে মনে ভাবতে হবে নিশ্চয়ই উহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। কারণ মানুষের কি সাধ্য যে ভগবানের কাজ বুঝে? সম্পূর্ণরূপে তাঁর দ্বারে পড়ে না থাকলে তাঁর কৃপা হয় না। আমিত্বকে একেবারে নাশ না করলে তাঁকে কি করে পাবে?"

* * *

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩১। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষজী মঠের পূর্ব্ব-দিকের বারান্দায় একখানা easy chair-এ (আরাম কেদারায়) বসিয়া আছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হইল।

মহাপুরুষজী—"রাধারাণী তো খুব সতী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা। কিন্তু লোকে না জেনে তাঁকে অনেক কথা বলত; তিনি কিন্তু এক কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানতেন না। অন্য কোন ভাব তাঁর মনে জাগত না। কেনই বা জাগবে? তিনি যে সতী। একদিন রাধারাণীকে পরীক্ষা করবার জন্য

একটি বহুছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনবার জন্য তাঁর আত্মীয়রা বললেন, 'যদি সতী হও, তবে এক ফোঁটা জলও পড়বে না।' রাধারাণী বললেন, 'তা বেশ, তাঁর নাম করে আনছি; যা হবার হবে।' রাধা জল আনলেন, কিন্তু সেই সহস্রছিদ্র কলসী থেকে এক ফোঁটাও জল পড়ল না; তা দেখে সকলেই অবাক ও রাধারাণীর প্রশংসা করতে লাগলেন। রাধারাণী বললেন, 'আমাকে কেন প্রশংসা করছ, এ কি সম্ভব যে ছিদ্র কলসীতে জল আমি আনতে পারি? তিনিই আনিয়েছেন, এ তাঁরই শক্তি ও লীলা।' আমরাও এক ঠাকুরকেই জানি, এ সমস্ত তাঁরই খেলা, তা ভিন্ন আর কিছু জানি না। তিনি 'রামকৃষ্ণ' এই জানি।"

ইহার পর কথাপ্রসঙ্গে বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী-মূর্ত্তির কথা উঠিল।

মহাপুরুষজী—"বহুদিন পূর্ব্বে দেখেছি। ভূ-কে বলেছি তাঁর একটি মূর্ত্তি আনতে। বড় চমৎকার মূর্ত্তি। বহুদিন হ'ল আমি ও হরি মহারাজ গিয়েছিলুম। হরি মহারাজ মূর্ত্তি দেখে বললেন— 'এই মূর্ত্তি ঠিক ঠিক মার মূর্ত্তি।' তিনি যেন জগতের সকলকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। শিবের নাভি হতে একটি পদ্ম ফুটে উঠেছে, তার উপর মার মূর্ত্তি। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—এসব হল জীবের ভাব। নাভির উপর থেকেই দেব-ভাব। (এই বলিয়া তিনি ষট্‌চক্রের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন)। (বি-কে লক্ষ্য করিয়া) আজকাল আমার ভাল ঘুম হয় না। কেবল দেবদেবীর মূর্ত্তি-দর্শন হয়, মহামায়া অনেক দেখাচ্ছেন। মহামায়া ভিন্ন এত সব কেউ দেখাতে পারেন না। তোমাকে বলেছিলুম একদিন একটি vision (দর্শন) দেখলুম। তাতেই মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর এই

শরীর আরও দিন কতক রাখবেন, দু-তিন বৎসর। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সব দেখেছি। তাই মনে হয়, তোমরা ভাবছ এই শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) গেলে ঠাকুরের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে; কখনও না। (ন-বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা বড় সুন্দর সময়ে এসেছ; এ সময়ে সকলেরই হবে। ঠাকুর বলেছেন যে কোন ভয় নেই। এ সময়ে যারা এসেছে তারা এবার তরে যাবে। দেখ, স্বামীজী বলেছেন—সাতশ-আটশ বছর এই ভাব চলবে। মাত্র ঊনত্রিশ বছর হল স্বামীজী চলে গেছেন, তার ভেতর কত কি হল! তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এখনও ঢের বাকী—সকলকেই তিনি নিয়ে যাবেন, কোন ভয় নেই।"

ইহার পর তিনি জলযোগ করিতে উঠিলেন, ভক্তেরাও চলিয়া গেলেন। এই সময় শ-মহারাজ বলিলেন, "অ-বাবু স্বপ্ন দেখেছে যে আপনি তাঁর কাছে একজোড়া চটিজুতা চেয়েছেন, তাই তিনি আপনার পায়ের মাপ নিতে এসেছেন।" মহাপুরুষজী—"বেশ, নিক।"

মহাপুরুষজী একখানা কাগজের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। অ- একটি blue pencil (নীল পেনসিল) দিয়া তাঁহার পায়ের মাপ আঁকিয়া লইলেন। মহাপুরুষজী অ-কে বলিলেন, "তুমি কি পূজা করার জন্য নিতে চাও?" অ-—"না মহারাজ, আপনি পায়ে দেবেন। আপনার কি রকম পছন্দ বলুন।" মহাপুরুষজী—"আমার কোন পছন্দ নেই, বাবা। তোমার দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, দাও।" অ-—"হ্যাঁ মহারাজ, আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।" মহাপুরুষজী—"তা বেশ।" আমি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* * *

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩১। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষজীর জন্য একজোড়া velvet (মখমল)-এর চটিজুতা ও কিছু পটল লইয়া বৈকাল প্রায় ৪-৩০ মিঃ সময় মঠে উপস্থিত হইলাম। তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। আমরা প্রণাম করিলাম। শ-মহারাজ বলিলেন, "সেদিন যিনি আপনার পায়ের মাপ নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি জুতো এনেছেন।" মহাপুরুষজী বালকের মত খুশী হইয়া জুতা পায়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "চামড়ার জুতো কি?" অ-—"হ্যাঁ মহারাজ, soleটা চামড়ার, উপরে velvet দেওয়া।" কিছুক্ষণ পায়ে দেওয়ার পরে মহাপুরুষজী বলিলেন, "তুমি নাও।" আমি তো অবাক। তিনি পায়ে পরিবেন বলিয়া আনিয়াছি, ফেরৎ লইয়া যাইব কি করিয়া? যাহা হউক, পরে জনৈক সেবকের মধ্যস্থতায় তিনি পরিতে রাজী হইলেন। আমিও আশ্বস্ত হইলাম। কয়েকজন সন্ন্যাসী সেবকের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "এরা আমার খুব সেবা করছে।" প্রীত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হ'ক।" কথাপ্রসঙ্গে আবার বলিলেন, "ঠাকুর আমার কিছুরই অভাব রাখেন নি। জ্ঞান বল, ভক্তি বল, সব দিয়েছেন। এখন তাঁর কাজের জন্য রেখেছেন। সময় সময় সেবকদের খুব গালমন্দ করি, সেটা তাদের ভালর জন্যই। এসব চাবুক দেবার জন্যই বোধ হয় ঠাকুর আমাকে রেখেছেন। তবে heartily (আন্তরিকভাবে) ভালবাসি ওদের।" ইহার পর মহিলা ভক্তগণ আসিবেন বলিয়া আমরা প্রণাম করিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, "রোজ 'কথামৃত' পাঠ করবে।"

অ- তাহার এক ভগ্নীর মৃত্যু-সংবাদ জানাইল। মহারাজ—"দেখ অ-, এই তো সংসারের নিয়ম—আসছে, যাচ্ছে। এখানকার নিয়মই এই। তোমরা ঠাকুরের ভক্ত বলে যে কোন দুঃখ পাবে না, তা হতেই পারে না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস হ'ক; ঠাকুরের উপর বিশ্বাস বাড়ুক। অনিত্য জিনিসের জন্য তোমার যেন দুঃখ না হয়। তোমার যাতে জ্ঞান ভক্তি হয় তাই ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি।" অ- —"আপনার আশীর্ব্বাদ।"

মহাপুরুষজীর শরীর দুর্ব্বল। তাই তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং শয়ন করিলেন। আমাকে বলিলেন, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।" আমি দরজা বন্ধ করিয়া নীচে বসিয়া আছি, তিনি আস্তে আস্তে স্নেহমাখা স্বরে বলিতে লাগিলেন, "অ-, তোমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে, না?"

অ- —"হ্যাঁ মহারাজ, আমার এই বোন খুব ভক্তিমতী ছিলেন। গত ৺কালীপূজার সময় আপনাকে দর্শন করে গিয়েছিলেন। আমাকে শেষ সময় দেখবার জন্য তিনি বড় ব্যাকুল হয়েছিলেন। এমন কি নিজের ছেলেকেও দেখতে চান নি। শেষ সময়ে তাঁকে দর্শন করতে পেলুম না, এতে আরও কষ্ট হচ্ছে। তিনি এত ভাল ছিলেন যে শহরের লোকও তাঁর জন্য কাঁদছে।"

মহাপুরুষজী—"তিনি নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছে আছেন, ইহাতে সন্দেহ নেই। তোমার দুঃখ করবার আর কি আছে? ঠাকুরের কাছে যখন রয়েছেন তখন আর তোমার চিন্তা কি? মরবার সময় তাঁর দর্শন পেলে না—তা ঠাকুর উভয়ের মঙ্গলের জন্যই করেছেন। কারণ, দেখা হলে আবার কি একটা বন্ধন বেড়ে যেত কে জানে?

হয় তো তোমার আর একটা গ্রন্থি বেড়ে যেত। আমার বিশ্বাস, ঠাকুর ভক্তের মঙ্গলের জন্যই সব করেন। তুমি বললে, তিনি নিজের ছেলেকেও দেখতে চান নাই ; তুমি ঠাকুরের ভক্ত, তাই তোমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তা বেশ, তিনি তো ঠাকুরের কাছেই গেছেন। আর ভয় কি ? তিনি ঠাকুরের কাছে বেশ আছেন।"

প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার এই সস্নেহ ব্যবহারে ও সারগর্ভ উপদেশে সান্ত্বনা পাইলাম। তাঁহার কৃপায় অন্তরের শোকাবেগ অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

* * *

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। বেলুড় মঠ। বৈকাল প্রায় ৫ ঘটিকা হইবে। মহাপুরুষজী তাঁহার খাটে বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত মেজেতে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতেছেন। অ- উপস্থিত হইলে মহাপুরুষজী তাহাকে তাহার মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন।

অ-—"তিনি ভাল নেই, মহারাজ। জর হয়েছিল। এখন ফোড়া হয়েছে।"

মহাপুরুষজী—"এবার মনে হয় বুড়ী সরে পড়বে। (সহাস্যে) —তা বলা যায় না। কাশীতে বুড়ীগুলি অনেক দিন বাঁচে (সকলের হাস্য)। বিশ্বনাথের স্থান কাশীতে থাকলেই হয় না। এমন দেখেছি যে তিনি জোর করে অনেককে সরিয়ে দেন।"

অ-—"হ্যাঁ মহারাজ, আমার এক আত্মীয় প্রায় ৩০ বছর কাশীতে ছিলেন, কিন্তু পরে দেশে এসে দেহ গেল।"

মহাপুরুষজী—"হ্যাঁ, এমন শুনেছি, বহু দিন কাশীতে আছে, কিন্তু সেখানে কিছু হলো না, যেই মোগলসরাই এল অমনি মারা গেল।

এসব বুঝা যায় না। দেহ যেখানেই যাক তাই ভাল—যদি মৃত্যুর সময় তাঁর (ভগবানের) নাম করতে করতে যায়—সেই হল আসল কথা। তবে ঠাকুরের কথা, তিনি প্রত্যক্ষ সব দেখেছিলেন যে বিশ্বনাথ প্রত্যেক দেহীকে মৃত্যুর সময় অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করছেন। গীতাতেও আছে—মৃত্যুর সময় যে যা ভেবে দেহত্যাগ করবে, পরে সে তাই হবে। মোট কথা, জ্ঞান হলে যেখানেই দেহ যাক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আবার অনেকে কাশী গিয়েই মরে যায়, বেশী দিন ভোগে না। কাশীবাস সম্বন্ধে রামপ্রসাদেরও বেশ গান আছে।"

* * *

ইহার পর হইতে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। সুতরাং আর এইভাবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলা সম্ভব হইত না। অবশ্য আমরা প্রায়ই তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনে যাইতাম এবং তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সস্নেহ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ফিরিতাম। তাঁহার এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি ও সস্নেহ দৃষ্টি ছিল যে, একবার তাঁহার শ্রীচরণদর্শন করিলেই প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যাইত। আহা! এই ক্ষুদ্র জীবনেও তাঁহার যে অপার করুণা ও স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা সযত্নে অন্তরের মণিকোঠায় রক্ষিত আছে—তাহাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল ও পাথেয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

[দুই]

দশহরা, ১৯২২, সকালবেলা। পশ্চিমের বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া আছি—উপর হইতে পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরে একলা আছেন, এইবেলা দর্শন করে এস।" উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি চেয়ারে দক্ষিণাস্যে উপবিষ্ট, তামাক খাইতেছেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও চরণস্পর্শ করিয়া মেজেতে বসিলাম। কি নাম, কোথায় থাকি, কি কাজ করি, সংসারে কে কে আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লইবার পর তিনি সহাস্যে বলিলেন, "তোমার সব ভাল দেখছি, কিন্তু তুমি চাকরি কর—এটা ভাল নয়।" বলিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) বলেছিলেন, "বরং শুনবো গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিস্, তবু যেন না শুনি তুই পরের চাকরি করছিস্।" মহাপুরুষজী বলিলেন, "হ্যাঁ গো, ঠাকুর আমাকেও বলেছিলেন। আমরা কয়জন তাঁর কাছে বসে আছি—আমাকে দেখিয়ে অন্য ভক্তদের বললেন, 'ওরে দ্যাখ্, দ্যাখ্—এ চাকরি করে রে!'" আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী বলিলেন, "আজ এখানে প্রসাদ পেয়ে যেও।" মঠে আমি এই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নপ্রসাদ পাইলাম। ইতিমধ্যে অনেক সাধু ও ব্রহ্মচারী তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। নাচে আসিয়া দেখিলাম গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাপূজা হইতেছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী উপর হইতে পূজাস্থানে আসিলেন এবং পূজার ডালা হইতে পত্রপুষ্পাদি লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মা

গঙ্গাকে নিবেদন করিলেন ও প্রণাম করিয়া মন্থরগতিতে উপরে চলিয়া গেলেন।

বিকালবেলা। আবার তাঁহার ঘরে বসিয়া আছি, অনেকে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন। বিনোদবাবু প্রণাম করিয়া ফিরিবার সময় করজোড়ে মহাপুরুষজীকে বলিতেছেন, "মহারাজ, বড় মহারাজ আমাদের যেমন দেখিতেন, আপনিও আমাদের সেইরকম দেখিবেন।" মহাপুরুষজী বলিয়া উঠিলেন, "ও কি কথা বলছ, বিনোদ! মহারাজ ছিলেন লোকোত্তর মহাপুরুষ; তিনি তখনও যেমন তোমাদের দেখেছেন, এখনও তেমন দেখছেন।"

* * *

সকালবেলা। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া পশ্চিমাস্যে ধ্যান করিতেছেন। আমি বারান্দা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেইখানে বসিয়া আছি। অনেকক্ষণ ধ্যানের পর মহাপুরুষজী ঠাকুরের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তবটি এই—

ওঁ বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং, বিশ্বস্য বীজং করুণাপয়োধিঃ।
অনাদ্যনন্তং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ, তত্ত্বত্ত্বমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥
ন নেতি ভীত্যা শ্রুতয়ো বদন্তি, বদন্তি সাক্ষান্ন চ যং কদাচিৎ।
চিদেকরূপো শিব ঈশ্বরাণাং, মহেশ্বরোঽসৌ ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥
যং নিত্যমানন্দমনন্তমেকং, শিবেতি নাম্না শ্রুতয়ো গৃণন্তি।
তস্যাবতারো নররূপধারী, কৃপাম্বুধাব্ধি র্ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ইত্যাদি।

যখনই বলিতেছেন 'ভুবি রামকৃষ্ণঃ', তখনই তাঁহার সম্মুখে গ্লাসকেসে রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিতেছেন। পাঠের পর ঠাকুরের শয়নঘরের ভিতর দিয়া (এখন তাঁহার ঘর) বারান্দায়

আসিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম—বেশ প্রশান্তমূর্ত্তি, সহাস্যবদন ও সস্নেহদৃষ্টি। ছাদের উপর দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী তাঁহার খাটের উত্তর দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট। একটি প্রবীণ ভক্ত একটু গঙ্গামাটি আনিয়া মহাপুরুষজীর সমস্ত দক্ষিণ চরণটিতে বুলাইতে লাগিলেন। তিনি উচ্চহাস্যে বলিলেন, "তুমি ও কি কচ্ছ হে?" ভক্তটি বলিলেন, "আমাদের পঞ্চানন (অর্থাৎ সালিখার পঞ্চানন ঘোষ) বড়মহারাজের চরণে এই রকম মাটি স্পর্শ করিয়া তাহা কবচে রাখিয়া ছেলেদের গলায় ধারণ করাইয়াছেন। আমিও এই মাটি দিয়া কবচ করিব।" মহাপুরুষজী—"আচ্ছা বিশ্বাস তোমার!"

* * *

সকালবেলা। মহাপুরুষজী খাটের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া স্তোত্র-পাঠ করিতেছেন। শেষ স্তোত্রটি এই—

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপীশং গোপনায়কম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্॥
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্॥
পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥ ইত্যাদি।

পাঠের পর সেবক মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, মিছরি

ভিজাব কি ?" তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, গরম জলে ভিজাও, তারপর সেটা গরমাগরম।" ইহা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

* * *

সকালবেলা। মহাপুরুষজী ঘরে চেয়ারে দক্ষিণাস্যে বসিয়া আছেন। একজন মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলেন। ইনি ⁄কাশীতে পূজ্যপাদ হরিমহারাজের শরীরত্যাগের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপুরুষজীকে বলিতে লাগিলেন যে শেষ সময়ে হরিমহারাজ নিজেকে ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ থাকাতে গঙ্গাধর মহারাজ সম্মত হইলেন না। হরিমহারাজ বার বার বসাইয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ রাজী না হওয়াতে তাঁহাকে বেশ লম্বা করিয়া শোয়াইয়া দিতে বলিলেন। সেই অবস্থায় হরিমহারাজ 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম' ও ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শরীরত্যাগ করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "হরিমহারাজ ঠিকই বলেছিলেন—তিনি মহাযোগী, বসে যোগাবলম্বনে শরীরত্যাগ করবেন।…হরিমহারাজ যখন অত করে বললেন তখন তাঁকে একবার বসিয়ে দিলেই হ'ত।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাধুটিকে বলিতেছেন, "⁄কাশীতে অত বড় সাধুর শরীরত্যাগ দেখলি—খুব ভাল হ'ল।"

* * *

বিকালবেলা। একটি কলেজের ছাত্র দুপুরবেলা মঠে আসিয়াছে। সে (ছাত্রটি) একজন সাধুকে শয্যায় শায়িত দেখিয়া তাঁহাকে "দিবানিদ্রা খারাপ" বলিয়া একটি সংস্কৃত বচন শুনাইয়াছে। একটি

প্রবীণ ভক্ত তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিকালে ঐ ছাত্রটিকে মহাপুরুষজীর সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিতেছেন, "এটা তোমার কলেজ নয়, এখানে তোমার উপদেশ চলবে না, এটা বেলুড় মঠ মনে রেখ।" মহাপুরুষজী সমস্ত শুনিয়া যুবকটিকে বলিলেন, "তুমি জান না, ঐ সাধুটি হয়তো রাত্রে জপ, ধ্যান, ঈশ্বর-চিন্তা করেছে, তাই দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম করছে। কিংবা তার শরীরও খারাপ হতে পারে। তুমি না জেনে শুনে কোন সাধুর সম্বন্ধে কিছু remark (মন্তব্য) করবে না। তুমি মঠে এসে সাধুদের প্রণাম করবে ও তাঁদের সঙ্গে সদালাপ করবে।"

* * *

শ্রীশ্রীশারদীয়া সপ্তমী পূজা। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। পূর্ব্বের বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপর মহাপুরুষজী, সারদানন্দজী ও অভেদানন্দজী পূর্ব্বাস্যে উপবিষ্ট। তিন জনেই তিন গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। মেজেতে অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন। পূজার দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন সাক্ষাৎ সন্তানকে একসঙ্গে পাইয়া ভক্তেরা আনন্দে ভরপুর। পুলিনবাবু একটি ভক্তসঙ্গে আসিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজী সঙ্গীকে দেখাইয়া পুলিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে? মুখখানি চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।" পুলিনবাবু—"ইনি আমার বন্ধু, কলিকাতায় ব্যবসা আছে। মঠে পূজার টাকা দিতে পারবেন না বলে প্রথমে আসতে চাইছিলেন না; এঁকে নিয়ে এসেছি।"

মহাপুরুষজী—"আমরা সাধু ফকির মানুষ, আমাদের টাকা কি হবে? আমাদের এখানে ভক্তির পূজা। মঠে টাকা দিতে পারব না বলে পূজা দেখতে আসব না—এ কেমন কথা!" কিয়ৎক্ষণ পরে

মহাপুরুষজী ও অভেদানন্দজী উপরে গেলেন এবং সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমার মন্দিরের দিকে গেলেন।

বেলা সাড়ে বারটা। মহাপুরুষজী পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মেজেতে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। অদূরে উঠানে মণ্ডপে সপ্তমী পূজা হইতেছে। এমন সময় পূজ্যপাদ মাস্টার মহাশয় আসিলেন। মহাপুরুষজী—"এই যে মাস্টার মশায় এসেছেন—আসুন"—বলিয়া তাঁহার বেঞ্চের উপর পাতা লেপখানি বড় করিয়া বিছাইয়া দিতে বলিলেন এবং দুইজনে তাহার উপর বসিয়া সহাস্যে আলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা ২।৩ খানি পাখা লইয়া তাঁহাদের বাতাস করিতেছেন।

মহাপুরুষজী—"দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সেবা-পূজার বেশ বন্দোবস্ত হয়েছে, বড়ই বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, ভোগরাগাদি ঠিক্ ঠিক্ হচ্ছে। মা একটু দৃষ্টিপাত করেছেন আর সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। (আনন্দে) আবার নহবত বসেছে।"

মাস্টার মঃ—"তবে তো সেই সব দিনের (অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ের) কথা মনে পড়বে।"

এমন সময় অভেদানন্দজী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া বলিতেছেন—"এই যে Divine Trinity (ত্রিমূর্ত্তি)—শ্রীম, মণি, মাষ্টার—একে তিন, তিনে এক।" মহাপুরুষজী ও মাস্টার মহাশয় হাসিতেছেন।

* * *

বিকালবেলা। ঘরে পাঁচ-ছয়টি ভক্ত আছেন। 'কথামৃত' সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

মহাপুরুষজী—"মাস্টার মশায় ঠাকুরের মুখের কথাগুলি তাঁর বই-এ ঠিক ঠিক বসিয়ে দিয়েছেন। ওঁর সব আগে note করা (টোকা) ছিল, তা থেকে 'কথামৃত' করেছেন।"

একটি ভক্ত—"কলকাতায় থাকি, মঠে আসা তো প্রায় হয়ে উঠে না, সময় পেলে মাস্টার মশায়ের কাছে যাই।"

মহাপুরুষজী—"খুব যাবে। মাস্টার মহাশয় কলকাতা আলো করে রয়েছেন, কলকাতা পবিত্র করে রয়েছেন। তাঁর কাছে খুব যাবে—তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা ছাড়া আর কোন কথা পাবে না।"

* * *

বিকালবেলা। আজ পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের তিথিপূজা। তাঁহার সম্বন্ধে মহাপুরুষজী কিছু বলিবেন। তিনি পূর্ব্বের বারান্দায় বড় বেঞ্চের একধারে বসিয়া আছেন, ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া।

মহাপুরুষজী—"বাবুরাম মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতেন; সেটা তাঁর দাদা পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায় বাটীতে না জানিয়ে লুকিয়ে আসতেন। একদিন বাবুরাম মঃ ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তার কিছু পরেই তাঁর দাদা তুলসীরাম বাবুও এসেছেন। বাবুরাম মঃ ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে আছেন। পরে তুলসীরাম বাবু একটু সরে গেলে তিনি ঠাকুরের নিকট এলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে হেসে বললেন, 'ঐরে তোর আয়ান এসেছে।' ঠাকুরের কথার ভাব এই—বাবুরাম মঃ শ্রীমতীর অংশে জন্মেছেন; তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) দর্শন করতে এসেছেন, এমন সময় তাঁর দাদা (প্রতিবন্ধক) এসে পড়েছেন; তাই আয়ানের সঙ্গে তুলনা করলেন। কেমন সুন্দর কথাটি ঠাকুর বললেন!

"স্বামীজী গাজীপুরে পওহারী বাবার ওখানে আছেন, মঠে আসছেন না। বাবুরাম মঃ তাঁকে আনতে গেলেন এবং মঠে ফিরে আসবার জন্য তাঁকে খুব অনুরোধ করলেন। স্বামীজী কিছুতেই আসতে চান না ; বললেন, 'তুই ফিরে যা, আমি এখানে থাকব, আমি মঠে যাব না, তোদের ঠাকুর নির্ব্বাণ নিয়েছে।' বাবুরাম মঃ কাঁদতে লাগলেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্য সান্যাল ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন, 'ছিঃ নরেন, তুমি কি বলছ, তুমি কা'কে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) দেখেছ আর এখানে কি নিয়ে রয়েছ? তোমাকে নিতে এসেছে, তুমি মঠে ফিরে যাও।' তারপর স্বামীজী ফিরে এলেন।"

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী ঘরে দক্ষিণাস্থে চেয়ারে উপবিষ্ট। দুইটি ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিল। তাহাদের কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াছিল কিনা। একজন বলিল যে তাহারা প্রথমেই তাঁহার নিকট আসিয়াছে, ঠাকুরঘরে পরে যাইবে।

মহাপুরুষজী—"সে কি হে? আগে ঠাকুরঘরে যাবে, তারপরে এখানে আসবে। আগে তিনি, তারপর আমরা, তাঁর জন্যই সব।"

ভক্ত (সহাস্যে)—"ওখানে গেলে চুপচাপ বসে থাকতে হয়, আর আপনার এখানে এলে কথাবার্ত্তা বেশ চলে।"

মহাপুরুষজী—"তিনি প্রাণে প্রাণে কথা বলেন। মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।"

এই বলিয়া ভক্ত দুইটিকে ঠাকুরপ্রণাম করিতে পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রণামান্তে প্রসাদ চাহিয়া লইতে বলিলেন।

* * *

সকালবেলা। মহাপুরুষজী ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "মৃত্তিকা থেকে অনেক জিনিস তৈরী হয়; কিন্তু এক মৃত্তিকাকে জানলেই সব জিনিস জানা হ'ল।" এই বলিয়া উপনিষদের একটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেন এবং স্বামী বিজয়ানন্দকে পুস্তকের ঐ অংশটি দেখাইতে বলিলেন। তিনি উহা দেখাইয়া গেলেন।

* * *

বিকালবেলা। মাস্টার মহাশয় কয়েক মাস পুরীতে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া মঠদর্শনে আসিয়াছেন। পূর্ব্বের বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপর মহাপুরুষজী ও মাস্টার মহাশয় বসিয়া আছেন। পুরীতে কিভাবে কয়মাস ছিলেন মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন। সমস্ত শুনিয়া মহাপুরুষজী সহাস্যে বলিতেছেন, "সব শুনেছি—পুরীতে গেছেন, শশী নিকেতনে আছেন, নির্জ্জনে বাস কচ্ছেন, সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসছেন, মন্দির থেকে প্রসাদ আসছে। কিন্তু এখানকার কাজ (অর্থাৎ কলিকাতায় ভক্তদের সঙ্গে নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ করা) কি হচ্ছে? এখানে যে কাজ বন্ধ রয়েছে। সব শুনছি আর মনে করছি—দেখিনা কতদিন চলে।" মাস্টার মহাশয় (সহাস্যে)—"হ্যাঁ, দিন কতক ঘুরে আসা গেল।"

* * *

বিকালবেলা। Visitors' Room-এ মিশনের সাধারণ সভা শেষ হইয়াছে। অনেকে বাহিরে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী, স্যারদানন্দজী ও অভেদানন্দজী তখনও বসিয়া আছেন। তিন জনেই আলখাল্লাপরা। অভেদানন্দজী বলিতেছেন, "অনেকে আমাকে বলে—ঠাকুরের

মঠ-মিশন তো আছে ; আপনি আবার আর একটি নূতন মঠ করলেন কেন ? আমি তাদের বলি—আমি এটি করেছি বটে, কিন্তু পরে আমি মঠের হাতেই তুলে দেব।” অভেদানন্দজী বাহিরে আসিলেন। মহাপুরুষজী (যেখানে বাদ্যযন্ত্র থাকে সেখানে বসিয়া আছেন) সহাস্যে বলিতেছেন—“মিটিং (সভা) আর কি ? এই তো মিটিং হয়ে গেল, ওদিকে আলুর দম জুড়িয়ে গেল, লুচি শুকিয়ে গেল— এবারে সব উঠে পড় (সকলের হাস্য)।”

* * *

বিকালবেলা। “মহাপুরুষজী দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর মঠে ফিরিয়াছেন জানিয়া মাস্টার মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে যাইতেছিলেন এমন সময়ে মহাপুরুষজী বলিয়া পাঠাইলেন যে মাস্টার মহাশয়ের উপরে উঠতে কষ্ট হবে, তিনিই নীচে আসিতেছেন। মহাপুরুষজীর শরীর এখন বেশ সুস্থ ও সবল। তিনি সিঁড়ি দিয়া খুব তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। দুইজনে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চে বসিয়া আছেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর মহাপুরুষজী বলিতে লাগিলেন, “ওদিকে ঠাকুরের মহিমা দেখে আমার খুব আহ্লাদ হ’ল। তাঁর ভাব বেশ প্রচার হচ্ছে, ভক্তসংখ্যা বাড়ছে ; তাঁর নাম, তাঁর ভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। (সহাস্যে) দেখুন, এক জায়গায় আমাকে lecture (বক্তৃতা) দিতে বললে। আমি আর কি lecture দেব ? আমি ঠাকুরের নাম করে তাদের সব আশীর্ব্বাদ করে দিলুম।” মাস্টার মঃ—“বেশ করেছেন, বেশ করেছেন, তারা আপনার কাছ থেকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ পেয়ে গেল।”

* * *

বিকালবেলা। মঠবাড়ীর পূর্ব্ব প্রাঙ্গণে মহাপুরুষজী ও সারদানন্দজী একটি ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের পেশী-সঞ্চালন ও নানাবিধ কসরতের খেলা দেখিয়াছেন। পরে পশ্চিম দিকে আসিয়া বসিলেন। মহাপুরুষজী সারদানন্দজীকে বলিতেছেন, "আমার খুব আহ্লাদ হয়েছে, ছেলেরা বেশ সব শিখেছে, শরীর-চর্চ্চায় মন দিয়েছে—এ খুব ভাল।" সারদানন্দজী (সহাস্যে)—"সেই ছেলেটি যখন (বিশেষ) কসরতটি দেখাচ্ছিল, তখন আমি দুর্গানাম জপ করছিলাম।" আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি বিদায় লইবেন বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহাপুরুষজীও দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন। সারদানন্দজী বলিলেন—"আপনি উঠবেন না, আমি আমার ঠিক লইতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া মহাপুরুষজীর পদধূলি লইয়া যাত্রা করিলেন।

* * *

বিকালবেলা। ঘরে মহাপুরুষজী দক্ষিণাস্যে চেয়ারে বসিয়াছেন। একটি ভক্ত বলিলেন, "আমার ধ্যান হয় না। জপ হয়, কিন্তু ধ্যান করতে পারি না।" মহাপুরুষজী—"তুমি বেশ ভাল ক'রে ঠাকুরের ছবিখানি অনেকক্ষণ দেখে নেবে, তারপর ধ্যান আরম্ভ করবে। প্রথমে চরণ থেকে আরম্ভ করবে। তা হলেই পারবে।" আর একটি ভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর আর স্বামীজীর উপদেশ যেন বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। ঠাকুর বলেছেন—বাহিরের কাজ সংক্ষেপ ক'রে ঈশ্বরে বেশী ক'রে মন দিতে। সম্মুখে যে কাজটা পড়বে, সেটি কর্ত্তব্য বোধ ক'রে করবে ; আর বেশী কাজ জড়াতে বারণ করেছেন।

স্বামীজী কিন্তু দরিদ্রনারায়ণসেবা, জনহিতকর কাজ, দেশের কল্যাণ করা ইত্যাদি বলেছেন।" মহাপুরুষজী হাসিয়া বলিতেছেন, "ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর জপ ধ্যান করতে করতে অন্তরে দয়া আসে; দয়া তাঁরই দান। এই দয়া থেকে আবার লোকহিতকর কাজ হয়ে থাকে।"

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে দক্ষিণাস্যে চেয়ারে উপবিষ্ট। প্রণাম করিয়া ফিরিতেছি—এমন সময় তিনি বলিলেন, "দেখ, ওকে (একজন সাধুর নাম করিয়া) বলো সে অনেক দিন মঠ ছেড়ে বাইরে রয়েছে। এবারে এসে যেন মঠে কাজকর্ম্ম করে। এ সমস্ত তাঁর গুরুর কাজ। গুরুর কাজ সে করবে না? মহারাজই এ সমস্ত আরম্ভ করে গেছেন, আমি তো তাঁর কাজই চালাচ্ছি। তুমি আমার নাম করে তাকে বলবে যে আমি তাকে মঠে আসতে বলেছি, এখানে এসে যেন কিছু কাজ নিয়ে থাকে।"

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী খাটের একপাশে দক্ষিণাস্যে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"আমাকে জপের মালা দেবেন না?" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "মালা কিরে? মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। মন্ মন্ জপে বলিহারি যাই॥ তোর মালার দরকার নাই, তুই এই এই···করবি।"

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী ছাদের দ্বার দিয়া ঘরে আসিয়া পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়াছেন। একটি ভক্ত তাঁহার মাতৃবিয়োগের কথা

জানাইলেন। মহাপুরুষজী দুঃখিত হইয়া ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মার কত বয়স হয়েছিল, সেবা ও চিকিৎসা ঠিক ঠিক হয়েছিল কিনা, শেষ সময়ে কাছে ছিলে কিনা ইত্যাদি। পরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শরীর তো কারুরই থাকবে না, আগে আর পিছে। তবে তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য, অবিনাশী—তাঁর দয়ায় তাঁতে মন রাখতে পারলেই ব্যস্।"

* * *

বিকালবেলা। তিনি তাঁর ঘরে দক্ষিণাস্থে চেয়ারে উপবিষ্ট। একটি ভক্ত বেশ উচ্চশিক্ষিত কিন্তু তাঁহার কোন উপার্জ্জন নাই। মহাপুরুষজী ভক্তটির নিরন্নতার কথা জানিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার এখন কি করে চলছে?" ভক্তটি—"আমার ধার করে চলছে।" মহাপুরুষজী (আমার দিকে চাহিয়া)—"ওরে, এ কি বল্‌ছে রে!" একটু চুপ করিয়া সেই ভক্তটিকে সস্নেহে বলিতেছেন, "তোমার এ কষ্ট থাকবে না।"

মাস্টার মহাশয়ের শরীর খুব অসুস্থ, চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি চারতলা হইতে নীচে নামিয়া রাস্তায় আসেন ও চলাফেরা করেন। মহাপুরুষজী এই সমস্ত শুনিয়াছেন। আমাকে বলিতেছেন, "তিনি রাস্তায় নেমে এসে এদিক-ওদিক বেড়ান, এখানে-ওখানে যান—এই কি বিশ্রাম হচ্ছে? তোরা দেখিস্ না?" আমি বলিলাম, "আমরা তো সব সময় তাঁর কাছে থাকতে পারি না, তা ছাড়া তিনি বলেন—যতটা ক্ষমতায় কুলায় ততটা করি, তার বেশী তো আর যাই না।" মহাপুরুষজী—"দিন কতক তাঁর পক্ষে বিশ্রাম খুবই দরকার। আমার নাম ক'রে বলবি, আমি বারণ

করেছি—বড়জোর চারতলা থেকে তিনতলায় আসতে পারেন, কিন্তু রাস্তায় চলাফেরা একেবারেই ঠিক নয়, কোন্ দিন কি একটা tragedy (দুর্ঘটনা) ঘটাবেন।”

* * *

বিকালবেলা। একটি ভক্ত মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষজী (সহাস্যে) বলিলেন, “শরীরের কথা আর কেন বল। ও শুচ্ছে, বস্ছে, উঠছে, দাঁড়াচ্ছে, ঘুরছে, ফিরছে, কত কি করছে! ওর কথা আর কি বলব? তবে আমি তো আর শরীর নই। আমি ঠিক থাকব—শরীর আস্তে আস্তে চলে যাবে।”

* * *

বিকালবেলা। মহাপুরুষজী পীড়িত, শয্যাশায়ী ও বাক্শক্তিহীন। শরীর অবশ। ছাদের দরজা দিয়া কয়েকজন ঘরে প্রবেশ করিলাম। একজন বলিয়া উঠিলেন, “আহা! সাক্ষাৎ শিবদর্শন।” প্রণাম করিতেই মুখের ইঙ্গিত করিলেন। আমি বলিলাম, “মহারাজ, আমরা সকলে ভাল আছি, আমাদের সমস্ত কুশল।” মুখখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বামহাত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বিশ্বাস

[তিন]

ইং ১৯২২ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ভক্তগণের আকুল আগ্রহে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দসহ বেলুড় মঠ হইতে ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন। মহাপুরুষজী তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সকালে বিকালে ও সন্ধ্যায় অগণিত ভক্ত নরনারী ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সমবেত হইতে লাগিল। আমিও এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং দুই-এক দিন তাঁহার পদসেবা করিবার দুর্লভ সুযোগ পাইয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

মহাপুরুষজী ঢাকায় প্রায় দেড়মাস ছিলেন। তাঁহার অবস্থান-কালে তথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ যেন তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। শত শত ভক্ত-যাত্রীর নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই থাকিত। সর্ব্বশ্রেণীর অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারী মহাপুরুষজীর সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী মধুর উপদেশ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইত। তাঁহার অন্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণময় ছিল—তিনি খোলাখুলিই ভক্তগণকে বলিতেন, "আমি, বাবা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানি নে—সাধু ফকির মানুষ। ঠাকুরই আমার অন্তরাত্মা—তিনি যা বলাবেন তাই বলব, যা করাবেন তাই করব। অন্য কিছুর খবরাখবর জানি নে; জানবার দরকারও নেই।"

মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে সমবেত ভক্তদের নিকট সাধন-ভজন, ধ্যান-

ধারণা, জপ-তপ-উপাসনা সম্বন্ধে কার্য্যকর উপদেশাদি প্রদান করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন মহাপুরুষজী আমাকে তাঁহার পদসেবার সুযোগ দিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীর ঢাকায় অবস্থানকালে সরকার অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ সেদিন সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় কথা বলার পর পদসেবারত আমাকে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন অসহযোগ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে খবরাখবর রাখিতাম এবং গান্ধী-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (Young India) রীতিমত পড়িতাম। আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, গান্ধীজী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে British Lion Shakes its Manes (ব্রিটিশ সিংহ কেশর নাড়িতেছে) এবং Poles Asunder (রাজা-প্রজায় সম্বন্ধ মেরু-ব্যবধানের মতো) নামক দুইটি নির্ভীক ও স্পষ্টোক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দুইটি লেখাই সরকারের নিকট রাজদ্রোহাত্মক (seditious) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বিচার হইবে।" ইহা জানিয়া মহাপুরুষজী তখনই প্রবন্ধ দুইটি শুনিতে চাহিলেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠাগারে তখন অভয় আশ্রম এক কপি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য বিনামূল্যে দিত। আমি তখনই লাইব্রেরী হইতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' আনিয়া মহাপুরুষজীকে প্রবন্ধ দুইটি পড়িয়া শুনাইলাম। পাঠের সময় তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া মনোযোগের সহিত শুনিলেন। পড়া শেষ হইলে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গান্ধী মহাত্মা লোক; তপস্যার জোর না থাকলে এরূপ নির্ভীকভাবে প্রবল পরাক্রান্ত রাজশাসনের

সমালোচনা করতে পারতেন না। তিনি নিজেই তো লিখেছেন—ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর প্রবন্ধগুলি রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। বাস্তবিকই, প্রার্থনার অসীম শক্তি—উহা অসম্ভবকে সম্ভব করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের শক্তির মূল উৎস। ভারতে ধার্ম্মিক ব্যক্তিই নেতৃত্ব করতে পারেন। নেতা ধার্ম্মিক না হলে ভারতে কেহ তাঁর কথা শোনে না। ধার্ম্মিক বলেই গান্ধী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সকলে তাঁকে মানছে।" পরে প্রসঙ্গান্তরে কবিদের সম্বন্ধেও মহাপুরুষজী বলিলেন, "ঠিক ঠিক কবি হ'তে হলেও আধ্যাত্মিক অনুভূতি চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল কবিদের অনেকেরই ইহা নেই। অনেকেই তাঁদের কবিতায় তত্ত্বের কথা লিখেন বটে, কিন্তু তাঁদের জীবনের সঙ্গে সেই সকল তত্ত্বের সম্বন্ধ খুব অল্পই আছে। উপনিষদে 'সর্ব্বদর্শী' অর্থে কবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মাকে 'কবির্মনীষী', 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্' বলা হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই প্রকৃত কবিত্বের স্ফুরণ হয়।"

আর একদিন বিকালে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঠাকুরঘরের সম্মুখস্থ চত্বরে মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র আসিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিল। মহারাজ ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কিছু বলবার আছে?" একটি ছাত্র বলিল, "আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারের কাজ কোথায় কিরূপ হইতেছে তাহা জানিবার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ। দয়া করিয়া তাহা

বলুন।" মহাপুরুষজী কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "আমি তো, বাবারা, আমেরিকায় যাই নি। ওদেশ সম্বন্ধে তোমাদের যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, আমার সঙ্গী স্বামী অভেদানন্দের (তিনি তখন নিকটেই আর একটি প্রকোষ্ঠে ছিলেন) কাছে জানতে পার। তিনি অনেক বৎসর আমেরিকায় ছিলেন, ওদেশ সম্বন্ধে সব জানেন। তোমরা তাঁর কাছে যাও। আমি সাধু ফকির মানুষ। ভগবান সম্বন্ধে দু-চার কথা জানি—সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো তো কিছু বলতে পারি।" ছাত্রগণ তখনই স্বামী অভেদানন্দের নিকট গেল। তাহারা সেস্থান ত্যাগ করিবামাত্রই মহাপুরুষজী তথায় দণ্ডায়মান আমাদের কয়েকজনকে বলিলেন, "দেখলে, এরা কেবল বাইরের খবর, দুনিয়ার খবর জানতে চায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানবার এদের মোটেই আগ্রহ নেই। কোথায় আমাদের কাছে আসবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে, ভগবানলাভের উপায় জানবার জন্যে—তা নয়, কেবল বহির্মুখ ভাব, বহির্মুখ দৃষ্টি। যার যেমনি ভাব, তার তেমনি লাভ। সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে আসতে হয় ধর্ম্মকথা শোনবার জন্যেই। সাধুই আচার্য্য—ভগবানের খবর রাখেন। দেশ-বিদেশের খবর বই-পুস্তকেই তো ঢের পাওয়া যায়।"

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অল্প দক্ষিণদিকে স্বামী ভোলানন্দ আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রমটি শ্রীভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য জমিদার শ্রীযোগেশ দাস কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামী ভোলানন্দ মহারাজ হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আসিয়া কিছুদিন যাবৎ ঐ আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। মহাপুরুষজীর ঢাকা মঠে অবস্থানের কথা শুনিয়া গিরিজী একদিন তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী ভোলানন্দকে যথোচিত সম্মানের সহিত আপ্যায়িত করেন। সাক্ষাৎমাত্র স্বামী ভোলানন্দ মহাপুরুষজীর পাদস্পর্শ করিয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম ও পরে সপ্রেম আলিঙ্গন করিলেন। প্রণামের সময় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "গিরিজী, পাদস্পর্শ করে আবার প্রণাম কেন? আপনি সাধু লোক।" তদুত্তরে স্বামী ভোলানন্দ হাতজোড় করিয়া খুব বিনীতভাবে বলিলেন, "সে কি! আপনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ পার্ষদ, আপনি নমস্য। আপনাকে প্রণাম করব না?" তারপর উভয়ের মধ্যে অনেক হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপাদি হইল। গিরিজী বিদায় লইয়া যাইবার সময় মহাপুরুষ মহারাজকে (ঢাকার) ভোলানন্দ আশ্রম পরিদর্শন করিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। গিরিজী চলিয়া গেলে মহাপুরুষজী নিকটস্থ ভক্তগণকে বলিলেন, "স্বামী ভোলানন্দ সাধু লোক। আমরা যখন উত্তরাখণ্ডে তপস্যাদি করেছিলাম তখনই তাঁকে কঠোর তপস্বী দেখেছি। আমাদের তপস্যাস্থানের নিকটেই তিনি সাধনভজন করতেন এবং প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো।" দুই দিন পর মহাপুরুষ মহারাজ ভক্তগণসহ পদব্রজে ভোলানন্দ আশ্রম পরিদর্শন করিতে যান। আশ্রমের ফটকের নিকট এক ভিখারী মহাপুরুষজীর সম্মুখে আসিয়া কাতরভাবে কিছু ভিক্ষা চাহিল। করুণার্দ্র মহারাজ ভিক্ষার্থীর দিকে একবার চাহিয়াই সঙ্গী ভক্তগণের কাহারও নিকট কিছু টাকা-পয়সা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। জনৈক ভক্ত তৎক্ষণাৎ একটি টাকা মহাপুরুষজীর হাতে দিলেন। "নে বাবা দরিদ্রনারায়ণ"—এই কথা বলিয়া মহাপুরুষজী টাকাটি ভিখারীকে দিলেন। আশ্রমটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া

মহারাজ খুব প্রীত হইলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, কীর্ত্তন প্রভৃতি নিত্যই চলিতেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ স্বয়ং ঐ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতেন। ফরাশগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসের 'গৌরাবাস' নামক প্রাসাদোপম ভবনের সম্মুখভাগে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত একটি ধর্ম্মালোচনা-কেন্দ্র ছিল। তথায় প্রতি শনিবার একটি সান্ধ্য অধিবেশনে ভজন, কীর্ত্তন, ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা হইত। মহাপুরুষজী ভক্তগণের আগ্রহে একদিন এই সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ পদার্পণে তত্রত্য ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। গৃহস্বামীর আগ্রহাতিশয্যে মহাপুরুষ মহারাজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া পরিবারস্থ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহির্বাটীর একটি প্রকোষ্ঠের দেয়ালে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতির সহিত শ্মশান-কালীর একখানা সুচিত্রিত বৃহৎ প্রতিকৃতিও শোভা পাইতেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ একে একে প্রতিকৃতিগুলির উদ্দেশে ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলেন, "শ্মশানকালীর প্রতিকৃতি গৃহস্থের বাড়ীতে রাখতে নেই। যদি রাখতেই হয়, তবে নিত্য নিয়মিতভাবে তাঁর পূজার্চ্চনাদি করতে হয়; না করলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে। আশ্রমে, মঠে, ঠাকুরবাড়ীতে রাখাই ভাল—সেখানে নিত্য নিয়মিত পূজার্চ্চনাদি হয়।" মহাপুরুষজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহস্বামী কিছুকাল পরে শ্মশানকালীর

পটখানি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পাঠাইয়া দেন। তদবধি উহা ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ফরাশগঞ্জে ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনের স্থানে প্রবেশ করিয়া মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিখানি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহার আসনগ্রহণের পর সম্মেলনের প্রারম্ভে যথারীতি 'রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে মজরে মনমধুপ মোর' নামক ভজন-সঙ্গীতটি গীত হইল। ভজন-সঙ্গীতের পর সমবেত আগ্রহশীল ভক্তগণ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপুরুষজীর আদেশে ধর্ম্মসভার প্রচলিত রীতি অনুসারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-পাঠ হইতে লাগিল। 'কথামৃত'-পাঠ শেষ হইলে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ভগবানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি?" মহাপুরুষজী উত্তরে বলিলেন, "শাস্ত্রে তো ভগবানলাভের উপায় সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ রয়েছে, কিন্তু শেষ কথা হ'ল শরণাগতি—শরণাগতি। শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন ক'রে সর্ব্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভয়-ভাবনা নেই। তবে ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি একদিনে আসে না। এ বড় কঠিন ব্যাপার। যত পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, কঠোর সাধনা—সবই একমাত্র শরণাগতি আনার জন্য। সর্ব্বোপরি চাই ভগবৎ-কৃপা। অনন্যমনে তাঁর ধ্যান চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা ক'রে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন।" মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত হন।

পরবর্ত্তী কালে একদিন বেলুড় মঠে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী এই 'গৌরাবাস' ভবনে ধর্ম্মসভার অধিবেশন সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, "ফরাশগঞ্জে প্রসন্ন বাবুর 'গৌরাবাস' ভবনটি বেশ চমৎকার। তুমি ওখানে থাক এবং কিছু কিছু ঠাকুরের কাজ করছ—বেশ ভাল স্থানেই আছ। ঠাকুর-স্বামীজীর কথা ওখানে নিয়মিতভাবে পাঠ ও আলোচনা করা হয়। তোমরা আমাকে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে ত্রিতলের ছাদের উপর নিয়ে গিয়েছিলে। ছাদের উপর ছোট ঘরটি ধ্যান-জপাদি করবার সুন্দর স্থান—কি নির্জ্জন ও উন্মুক্ত! তোমার কাছেই শুনলুম, গৃহস্বামীর ভক্তিমতী স্ত্রী ঠাকুরের 'কথামৃত' বই নিয়ে পড়ছে। খুব ভাল। 'কথামৃত' পড়লে আর কোনো ভাবনা নেই। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা পড়ে ও শুনে বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই ক্রমে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ হবে নিশ্চয়ই। ও বাড়ীর মঙ্গল হবেই হবে—জানবে।"

একদিন মহাপুরুষজী ভক্ত শ্রীহরেন্দ্র নাগ মহাশয়ের বুড়ীগঙ্গার অপরতীরস্থিত বেঞ্জারা গ্রামের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামদর্শন বোধ হয় মহাপুরুষজীর এই প্রথম। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর মহাপুরুষজী বলিলেন, "হরেনের ঐকান্তিক ভক্তি-বিশ্বাসে ও একনিষ্ঠ সেবাপূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর জাগ্রত হয়ে আছেন। এরূপ ভক্তিবিশ্বাস ও নিষ্ঠাতেই তো ভগবান ঘরে বাঁধা থাকেন। হরেন, ধন্য তুমি ও তোমার স্ত্রী।" গৃহস্বামী ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সেবাযত্ন ও আদর-আপ্যায়নে মহাপুরুষ মহারাজ অতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

ঢাকার ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের বহু ভক্ত নরনারী মহাপুরুষজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ পান নাই বলিয়া কাহাকেও প্রথমতঃ দীক্ষা দিতে চাহিলেন না। অবশেষে ভক্তগণের তীব্র ব্যাকুলতায় মহাপুরুষজীর প্রাণ করুণার্দ্র ও অস্থির হইল। তিনি আগ্রহশীল ভক্তগণের দীক্ষার একটা উপায় করিয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার নিজেরও অনুভূতি হইল, ঠাকুর যেন তাঁহাকে এই জন্য প্রেরণা দিতেছেন। তিনি গুরুভ্রাতা সংঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া পত্র লিখিলেন। গুরুভ্রাতা সানন্দে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—"খুব দীক্ষা দিন, প্রাণ খুলিয়া দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে, তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণা ও সংঘনায়কের সম্মতি পাইয়া মহাপুরুষজী ঢাকাতেই প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় একশত নরনারীকে কৃপা করেন। পরবর্ত্তী কালে এই সম্বন্ধে তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ঢাকাতে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর নাম পেয়েছে। সে সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভেতরও একটা ভাব এসেছিল। দেখ, ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজী, মহারাজ ও আমাকে বলেছিলেন—'কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।' আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম যে আমি কিন্তু ওসব পারব না। শুনে ঠাকুর বললেন, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে—তুই এখন এত ভাবিস্ কেন?' ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়?

সেই কতকালের কথা এতদিনে সত্য হ'ল। কে জানত, বাবা, যে আমায় দীক্ষা দিতে হবে?"

* * *

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে দুইজন সাধু হঃ মহারাজ ও শঃ মহারাজ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষজীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশে তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মারফত আমার দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিলাম। আমার ইচ্ছা মহারাজকে জানানো হইলে তিনি কৃপা করিতে সম্মত হইলেন। সাধু দুইজন আমাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, "মহাপুরুষজী প্রসন্নচিত্তে আপনাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন—'কাশীধাম শিবক্ষেত্র, দীক্ষার পক্ষে অতি উত্তম স্থান। সুবিধা হলে এখানে এসে দীক্ষা নিতে পারে। আর যদি এখানে আসার সুবিধা ও সুযোগ না হয়, বেলুড় মঠে ফিরে গেলে সেখানে দীক্ষা হতে পারবে।'" কাশী যাওয়া আমার সম্ভব হইল না। মহাপুরুষজী কাশী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন। পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে কলিকাতা রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে কলিকাতা বড়বাজার ঘাট হইতে পোর্টকমিশনারের ফেরি স্টীমারে বেলুড় মঠে যাই। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণামের পর পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করিতে গেলাম। মহাপুরুষজী সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে স্বামীজীর ঘরের উত্তর পাশে দোতলার লম্বা বারান্দায় উত্তরাস্য হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া একখানা আরাম কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। মহাপুরুষজীর জনৈক সেবক আমাকে তাঁহার সান্নিধ্যে লইয়া গিয়া আমার পরিচয়

দিলেন এবং দীক্ষার কথা বলিলেন। আমি পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মহারাজ আমার কুশল, কবে কলিকাতায় আসিয়াছি ও কোথায় উঠিয়াছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি করজোড়ে দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলাম। উহাতে মহারাজজী "তা হবে" বলিয়া নিজপ্রকোষ্ঠে গিয়া পাঁজি দেখিলেন এবং দীক্ষার তারিখ ও সময় বলিয়া দিলেন। আর বলিলেন, "দীক্ষার দিন গঙ্গাস্নান ক'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরঘরে প্রস্তুত থেকো। সন্ন্যাসী গুরুকে কিছু দিতে হবে না; তবে গুরুদক্ষিণা কিছু দিতে হয়—শাস্ত্রের বিধান। তা একটি হরীতকী দক্ষিণা দিলেই হবে।" দীক্ষার অনুমতি পাইয়া মনের আনন্দে ভরপুর হইলাম। প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণের সময় মহাপুরুষজী আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করিতে ও বেলুড় মঠের অন্যান্য দ্রষ্টব্যাদি দেখিতে বলিলেন।

বাংলা ১৩৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে—২রা জ্যৈষ্ঠ আমার দীক্ষার দিন। কিছু আম, মিষ্টদ্রব্য, একখানা ঢাকাই তাঁতের লালপেড়ে মিহি কাপড় ও কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণাসহ বেলুড় মঠে পুরাতন ঠাকুরঘরের বারান্দায় শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পরমারাধ্য মহাপুরুষজী নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজের ঘর হইতে ঠাকুরঘরে আসিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে রক্ষিত ও পূজিত পবিত্র ইষ্টকবচের দিকে মুখ করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া বসিতে আমাকে আদেশ করিলেন। মহারাজজী স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। আচমনাদির পর মহাপুরুষজী দীক্ষামন্ত্র গুরুগম্ভীর স্বরে অনেকবার উচ্চারণ করিলেন এবং আমাকে তদনুরূপ করিতে বলিলেন। তারপর মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিয়া কিভাবে নিত্য নিয়মিত জপ-ধ্যান করিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইষ্টকবচ যে পাত্রে রক্ষিত আছে, তাহা স্পর্শ ও প্রণাম করিতে বলিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন, "আজ হতে তোমার নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল। কায়মনোবাক্যে এই ইষ্টমন্ত্র সাধন করবে—যখন যেরূপ সুবিধা হয়, প্রতিদিন অন্ততঃ দুই সময়ে। আর ঠাকুর-স্বামীজীর কথা পড়বে, 'কথামৃত'-পাঠ করবে।" দীক্ষাশেষে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাও, মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে মনে মনে জপ অভ্যাস কর।" আমি আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জপ অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

দীক্ষা শেষ হইলে বেলা দশটা-সাড়ে দশটায় মহাপুরুষজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, আপনার পরিধানের জন্য ঢাকার জনৈক তাঁতীর তৈরী একখানা কাপড় আনিয়াছি। কৃপা করিয়া কাপড়খানা কয়েক দিন পরিলে বিশেষ কৃতার্থ হইব। দীক্ষার সময় কাপড়খানা আপনাকে দিব বলাতে কারিগর সানন্দে শুধু ন্যায্য মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছে, কোন লাভ লয় নাই। কাপড়খানা দেখিয়া আপনি কি অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁতীর খুব আগ্রহ দেখিয়াছি।" মহাপুরুষজী তখনই সেবককে কাপড়খানি আনিতে বলিলেন। কাপড়খানা হাতে লইয়া তিনি ইহার মিহি বুনানি, সরু পাড় ইত্যাদি দেখিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মসলিন-নির্ম্মাতাদের বংশধর ঢাকাই তাঁতীদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, আর বলিলেন, "কারিগরকে বলবে কাপড় বেশ চমৎকার হয়েছে। আমি তো বাবা বেশী কাপড়-চোপড় পরি না; ভক্তদের দেওয়া কত কাপড় জামা আলমারিতে পড়ে রয়েছে, কে

আর পরে। আচ্ছা, তোমার দেওয়া কাপড়খানা পরা যাবে।" এই বলিয়া সেবককে কাপড়খানা গেরুয়া রং করিয়া পরিতে দিতে আদেশ করিলেন।

দীক্ষার পরদিন বিকালে মহাপুরুষজী নিজ ঘরের উত্তরদিকের ছাদের উপর চেয়ারে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। নিকটে সেবক দাঁড়াইয়া। আমি গিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলাম। এমন সময় আর একজন সেবক একছড়া জপের মালা আমার হাতে দিলেন। তখন মহাপুরুষজী জপের মালা আমার নিকট হইতে চাহিয়া নিলেন, নিজ হাতে মালা ঘুরাইয়া জপের পদ্ধতি দেখাইলেন এবং মালাশোধন করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক অধ্যাপক ও আর এক ভদ্রলোক আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া তথায় বসিলেন। ভদ্রলোকটি অধ্যাপকের পরিচয় দিলেন। অধ্যাপক বলিলেন, "মহারাজ, আমি বর্ত্তমানে ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক। আমার নিজের বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায়। নানাবিধ ব্যারামে ভুগিয়া ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়াছি। এত নিকটে থাকিয়াও একবার বেলুড় মঠে আসিয়া আপনার শ্রীচরণদর্শন করিবার সুযোগ পাই নাই। সুযোগ পাইলেও মন হয় নাই। পাঠ্যকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতাম, শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতাদি শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সাধনপথে একটুও অগ্রসর হই নাই। জীবনটা বৃথাই গেল। এখন আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি। যদি কৃপা করিয়া অধমকে শ্রীপদে স্থান দেন, তবেই মনে শান্তি পাইব, নচেৎ এ জীবন একেবারে নিষ্ফল হইবে। আমার স্ত্রী খুব

ধর্ম্মপরায়ণা, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছেন। তিনি সাধনভজন খুব করেন, কিন্তু আমি ইহার কাছেই নই।" মহাপুরুষজী অধ্যাপকের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি! তোমার স্ত্রী যখন ধর্ম্মপথের সহায় আছে, তখন কোনও ভাবনা নেই। গত জীবন একেবারে ভুলে যাও। Begin your life afresh from now (এখন থেকে নূতনভাবে জীবন আরম্ভ কর)। সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছ তাতে কোন দোষ হয় নি। আমিও পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতুম। শিবনাথ শাস্ত্রী পণ্ডিত ও বক্তা ছিলেন—লোকও ভাল ছিলেন। আমরা অনেক দিন একসঙ্গে কত ধর্ম্মকথা আলোচনা করেছি। তবে ঐ তাঁর গোঁড়ামি একটু ছিল এই যা। ভগবান নিরাকার, তিনি সাকার হ'তে পারেন না—ব্রাহ্মদের এই গোঁড়ামি!" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ (সাকার ও নিরাকার) সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বলিলেন। আমরা যে কয়েক জন উপস্থিত ছিলাম, মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই গভীর তত্ত্বকথা শুনিলাম।

মহাপুরুষজীর সঙ্গে অধ্যাপকের অনেকক্ষণ আলাপ চলিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এই অধ্যাপকের সঙ্গে আমার দেখা ও আলাপ হয়। তখন জানিলাম তিনি মহাপুরুষজীর কৃপালাভ করিয়াছেন—নাম তারকদাস ঘোষ।

দীক্ষা উপলক্ষে বেলুড় মঠে যে কয়েক দিন ছিলাম, তন্মধ্যে একদিন প্রাতে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইব বলায় মহাপুরুষজী আমাকে বলিলেন, "যাবে বইকি। নিশ্চয়ই যাবে। দক্ষিণেশ্বর তীর্থরাজ—সকল তীর্থের সেরা। একবার যাবে কেন? সহস্র-বার যাবে। গিয়ে শুধু বেড়িয়ে আসবে না। শুধু গাছপালা,

মন্দির, দালান-কোঠা দেখে আসবে না। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের প্রধান তপস্যার স্থান, লীলাস্থল। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল কত কঠোর সাধনা করেছেন! যে যে স্থানে ঠাকুর সাধনা করেছেন, সে সে স্থানে কিছুক্ষণ ধীর স্থির হয়ে বসে ধ্যান জপ করবে—তাঁর কথা ভাববে, তবে তো উদ্দীপন হবে। নইলে শুধু এলে গেলে আর কি হবে! যাও, দর্শন করে এস।"

দীক্ষার পর আমি বাড়ী যাই। বাড়ী গিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণতি জানাইয়া একখানা পত্র লিখি। মহাপুরুষজী নিজহাতে পত্রের জবাবে লিখিলেন (১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ), "শ্রীমান্ রমণী, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তোমার সুমেরুবৎ অচল, অটল ও সুদৃঢ় ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা হউক, এবং তুমি তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একরূপ চলে যাচ্ছে। ইতি—সতত শুভানুধ্যায়ী শিবানন্দ।"

* * *

বৎসরে দুইবার—জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে ও ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে—মহাপুরুষজীকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে আসিতাম এবং কয়েক দিন তাঁহার সান্নিধ্যে কাটাইতাম। ১৯২৯ ইং ডিসেম্বর মাসে মহাপুরুষজীর অনুমতি লইয়া এক সপ্তাহ বেলুড় মঠে বাস করি। সঙ্গে কিছু ফল লইয়া গিয়াছিলাম। প্রণাম করিতেই মহাপুরুষজী কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরদর্শন, প্রণাম ও প্রসাদগ্রহণ করিতে বলিলেন। সেবক ফলগুলি মহারাজকে দেখাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ, রেখে দাও,

ফল খাওয়া যাবে।” ফলগুলির মধ্যে কালোজাম দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কালোজাম তাঁহার প্রিয় ফল ছিল, রক্ত-পরিষ্কারের জন্য ইহা খাইতেন। প্রাতে প্রণাম করিতে গেলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, “রাত্রে ঘুমের কোন অসুবিধা হয়নি তো? আমি তো বাবা এখন নীচে যেতেও পারি না, কারুর খোঁজখবরও নিতে পারি না।” কোন অসুবিধা হয় নাই বলিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন।

*　　*　　*

২৬শে ডিসেম্বর, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী। আজ মহাপুরুষজীর শুভ জন্মতিথি। বেলুড় মঠে বিস্তর ভক্ত-সমাগম হইতেছে। ভক্তগণ একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। মহাপুরুষজীও সকলকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ এবং সকলের মঙ্গলকামনা করিতেছেন। আমিও কিছু ফল, মিষ্টি ও একখানা কাপড় শ্রীচরণে উপস্থিত করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আমার যাহাতে ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার প্রণামের পর কয়েকজন মহিলা প্রণাম করিলে মহাপুরুষজী দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া নিমিলিতনেত্রে ভাবে তন্ময় হইয়া বলিতে লাগিলেন, “মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী।” শ্রীচরণে প্রণামী টাকা রাখাতে মহারাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন, “টাকা পায় দিতে নেই, মাটিতে রাখ।”

*　　*　　*

২৭।১২।২৯ ইং তারিখ প্রাতে প্রণাম করিতেই মহাপুরুষজী কিছুক্ষণ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “ঠাকুর তোমার ভিতর

সর্ব্বদা জাগ্রত থাকুন। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস জ্ঞান হউক।” কিভাবে প্রার্থনা করিতে হয় জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ বলিলেন, “খুব ব্যাকুল হয়ে ও আন্তরিকতার সহিত এভাবে প্রার্থনা করবে—‘হে প্রভো, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, জ্ঞান নেই, ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই, আমার কিছুই নেই। তুমি কৃপা ক’রে তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য দাও। তুমি যুগে যুগে দয়া ক’রে নানা রূপে আবির্ভূত হয়ে ভক্তদিগকে উদ্ধার করেছ, নতুবা তাদের কি সাধ্য ছিল যে তোমায় জানতে পারে। এবার তুমি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর।’ আর জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—তিনিই সব, লোককল্যাণের জন্য দেহধারণ করেছেন।”

* * *

২৮।১২।২৯ তারিখ প্রাতে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারের ঘরের দোতলা বারান্দায় আসিয়া উত্তর-দক্ষিণে পায়চারি করিতেছেন। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পায়চারি করিতে করিতে সূর্য্যের কিরণ বারান্দায় প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়াই মহাপুরুষজী বলিলেন, “সূর্য্যের তেজ জীবনস্বরূপ, সব সজীব হয়ে ওঠে।” তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “গায়ত্রীতেও ‘সবিতুর্বরেণ্যং’ এই কথা আছে। সবিতা জগৎকে পালন করছেন। গায়ত্রী কি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ! এখন গায়ত্রীমন্ত্রের বেশী চল নেই। কুলগুরুরা এই মন্ত্র দেন, কিন্তু শিষ্যরা অর্থ না বুঝে আবৃত্তি ও উচ্চারণ করে,

কাজেই উহা দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। অর্থ না বুঝে mechanically (কলের মতো) শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেই ফল হয় না, উহাতে ভক্তি বিশ্বাস লাভ হয় না। কেবল কতকগুলি শব্দের সমাবেশ। 'ওঁ হরিঃ', 'ওঁ নমো নারায়ণায়', 'ওঁ তৎ সৎ', 'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায়' প্রভৃতি মন্ত্রই যথেষ্ট, 'মা মা আনন্দময়ী' ইহাই যথেষ্ট—সংক্ষেপ, কাজ হয়। নচেৎ কতকগুলি শ্লোক—শব্দসমষ্টি আওড়িয়ে (অর্থ না বুঝে) লাভ কি? মন্ত্রোচ্চারণ আর তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা, ক্রন্দন—এতেই সব হয়। মানুষ এখন কিছুই করে না। শিক্ষাদাতাও নেই, গ্রহণকারীও নেই। অন্যান্য বৈষয়িক কাজে লোকে আনন্দ পায়, স্ফূর্তি পায়, কাজেই উহা করে। অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ ও জপ করলে কোন আনন্দ হয় না; তাই করতে রুচি হয় না এবং ফলও পায় না।"

* * *

ইং ১৯৩১ সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দুই ভক্ত-বন্ধু সুরথলাল দাস ও সুরেন্দ্র ঘোষ সহ উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে রওনা হইলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে আমার তীর্থভ্রমণের কথা পূর্ব্বেই পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলাম। ৮ই মে বিকালে মহাপুরুষজীকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই। ৯ই মে প্রাতে প্রণাম করিবামাত্রই মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তীর্থভ্রমণে যাবে, খুব আনন্দের কথা। যাবে বইকি—খুব যাবে। I approve of your plan (আমি তোমার ভ্রমণ-সূচীতে সম্মতি দিচ্ছি)।" কোন্ কোন্ তীর্থ পর্য্যটন করিব শুনিয়া মহাপুরুষজী নিকটে দণ্ডায়মান সেবককে বলিলেন, "রমণী কামারপুকুর, জয়রামবাটী, গয়া, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন; হরিদ্বার, কনখল,

এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে যাবে। যে-যে স্থানে আমাদের আশ্রম আছে তথায় অধ্যক্ষদের নিকট একখানা খোলা চিঠি লিখে দিও—আমি নাম দস্তখত করে দিব। লিখবে—রমণী ভক্ত, ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ খুব নিষ্ঠার সহিত করছে। আশ্রমে যেন থাকবার স্থান দেয় এবং তীর্থে যা কিছু করণীয় ও দর্শনীয় সব করার ও দেখবার বন্দোবস্ত করে দেয়। কোন অযত্ন যেন না হয়।" অযোধ্যা ও বৃন্দাবনে যাইব বলাতে বলিলেন, "এ দুই স্থানেই বানরের খুব উপদ্রব। খুব সাবধানে থাকবে, খুব সাবধানে থাকবে। আমরা যখন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরেছি ও তপস্যা করেছি তখন তো খুব উপদ্রব দেখেছি। অযোধ্যায় রামরাজত্ব কিনা, তাই সেখানে বানররা একেবারে স্বাধীন, কাউকে ভয় করে না, তাদের উপদ্রব খুব বেশী।" নিকটে তাঁহার একান্ত সচিব (Private Secretary) ও সেবকগণকে বানরের উৎপাতের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে, দুই তীর্থেই বানরের উপদ্রব পূর্ব্বের মতো এখন তেমন নাই; তবে আছে, অনেকটা কম। তাঁহারা আরও বলিলেন, "আপনি চিঠিতে নাম দস্তখত করিয়া দিলে যেখানেই যে মোহন্ত থাকুক খুব যত্ন করিবে।" সেবক শৈঃ মহারাজ চিঠিখানা লিখিয়া মহাপুরুষজীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চিঠিখানা শুনিয়া তিনি আমাদের পরিচয় আরও ভাল করিয়া লিখিবার জন্য বারবার জেদ করিতে লাগিলেন। সেবক বলিলেন—যাহা লিখিয়াছি ইহাই যথেষ্ট। তখন মহাপুরুষজী চিঠিতে নাম দস্তখত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এই চিঠি দিলেই সব হবে।" প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় আমাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন এবং বালকের মতো বারবার বলিতে লাগিলেন, "অযোধ্যায় বানরের উপদ্রব খুব বেশী। সাবধানে থাকবে।" মহাপুরুষজীর মধ্যে বালকের সরলতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

চিঠিখানা লইয়া আসিবার সময় সেবক শৈঃ মহারাজ বলিলেন, "আপনি যখন যেখানে থাকেন এবং যাহা কিছু দেখেন তাহার বর্ণনা দিয়া মহাপুরুষজীর নিকট চিঠি লিখিবেন। এই কথা ভুলিবেন না। চিঠি না পাইলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত থাকেন এবং অস্থির হইয়া আমাদের নিকট বারবার জিজ্ঞাসা করেন। ইহাই তাঁহার দরদী প্রকৃতি। আর আপনাদের তীর্থভ্রমণের বর্ণনা শুনিলে তিনি খুবই আনন্দিত হইবেন।" সেবকের এই নির্দেশ মানিয়া আমি কাশী, কনখল, দিল্লী ও মথুরা হইতে মহাপুরুষজীর নিকট চারখানি পত্র লিখিয়াছিলাম।

* * *

প্রায় দেড়মাস পর তীর্থভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। ২১।৬।৩১ তারিখে প্রাতে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতেই তিনি আমার কুশল ও তীর্থকৃত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার শরীর ও মন ভাল ছিল, তীর্থকৃত্যাদি ভালরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং সকল আশ্রমেই আদর-যত্ন পাইয়াছি শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। আমি আগ্রা হইতে একখানা শ্বেত পাথরের ছোট থালা (plate) আনিয়াছিলাম মহাপুরুষজীর জন্য। থালাখানা মহারাজের বিছানার উপর রাখিয়া বলিলাম, "মহারাজ, আপনার ব্যবহারের জন্য এই থালাখানা আনিয়াছি আগ্রা হইতে। ফল-মিষ্টি খাইবার জন্য আপনি কৃপা করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত কৃতার্থ

বোধ করিব।" মহারাজ থালাখানা হাতে লইয়া দেখিলেন এবং দাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যা হয় হ'বে।" পরে সেবককে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "থালাখানায় ফলমিষ্টি রেখে ঠাকুরকে ভোগ দিবে। ঠাকুরঘরেই ঠাকুরের কাজে থালাখানা ব্যবহার করিও। আমার বুড়ো শরীর, হাত কাঁপে, হাত থেকে পড়ে ইহা ভেঙ্গে যেতে পারে। ঠাকুরের কাজে লাগলেই, আমার কাজে লাগা হ'ল।" প্রতি কাজে ও কথায় মহাপুরুষজীর রামকৃষ্ণগত-প্রাণতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইত।

* * *

যে বৎসর ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) অধিবেশন হইয়াছিল, সে বৎসর সে সময়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করিতে আসি। কংগ্রেসের অধিবেশনেও দর্শকরূপে যোগদান করিয়াছিলাম। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের ইচ্ছার কথা মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি সম্মতি দিয়া বলিলেন, "তা বেশ তো, যাওয়া ভাল। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য সেরা ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে দেশের কল্যাণচিন্তা করছেন এবং স্বাধীনতা-লাভের উপায় সম্বন্ধে ভাবছেন—ইহাও ভাল কাজ। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ধর্ম্ম ও নরনারায়ণ-সেবার ভিতর দিয়ে হবে—স্বামীজী ইহা বিশ্বাস করতেন, আমরাও বিশ্বাস করি এবং তদনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করছি। আমাদের আলাদা রাস্তা।"

* * *

একদিন গঙ্গার ধারের গৃহের দোতলা বারান্দায় মহাপুরুষজী একটু পায়চারি করিতেছিলেন। আমি প্রণাম করিয়া আমার একটি সমস্যার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম—"মহারাজ, আইন পরীক্ষা পাশ করিয়াছি। সনদ লইয়া ওকালতি করিবার জন্য অভিভাবকরা পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কি করিব ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না।" মহাপুরুষজী আমার কাছে আসিয়া আমার মুখমণ্ডল একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "পারবে না, বাবা, পারবে না (হাতের আঙ্গুল নাড়িয়া)। ওকালতি করতে পারবে না। ও ব্যবসা করবার প্রকৃতি তোমার নয়। তোমার আলাদা প্রকৃতি ও সংস্কার—ধর্ম্মভাব বেশী। উকীলকে অনেক সময় মক্কেলের স্বার্থরক্ষার জন্যে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য সাজাতে হয়। হাইকোর্টে অবশ্য কিছুটা কম—কাগজপত্রদৃষ্টে মামলা করতে হয়। এ ব্যবসায়ে খুব হুনুরী বুদ্ধির দরকার। তা তুমি পারবে না। অভিভাবকরা বলুকগে—তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখছে।" মহাপুরুষজীর অন্তর্দৃষ্টি—ভিতরের প্রবৃত্তি দেখিবার ও বুঝিবার অদ্ভুত শক্তিতে বিস্মিত হইলাম। আমিও ইতস্ততঃ করিয়া প্রথমতঃ সনদ গ্রহণ করি নাই, কিন্তু পরে অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে সনদ লইয়া কিছুকাল ঢাকা জজ আদালতে যাওয়া-আসা করিতাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আদালতের আবহাওয়া আমার নিকট প্রকৃতপক্ষেই অস্বস্তিকর বোধ হইত। শেষ পর্য্যন্ত মহাপুরুষজীর কথাই সত্য হইল। আইন-ব্যবসা আমি ছাড়িয়া দিলাম।

* * *

আর একদিন কলিকাতা হইতে কিছু ফল-মিষ্টি লইয়া মহাপুরুষজীকে

দর্শন করিতে গেলাম। প্রণাম করিয়া ফল ইত্যাদি কাছে রাখিলাম। মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফল-মিষ্টি ঠাকুরকে দিয়েছ?" আমি একেবারে অপ্রস্তুত হইলাম, কারণ গুরুদর্শনের আগ্রহাতিশয্যে প্রথমেই ফলমিষ্টিসহ মহাপুরুষজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরঘরে তখনও যাই নাই। মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ ভাবে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "সে কি! ঠাকুরকে দেও নি? আগে ঠাকুর, তারপর আমরা। তিনি আছেন বলেই তো আমরা আছি। তাঁর অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জগৎব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্মান্)—উপনিষদে পড় নি? যাও, আগে ঠাকুরকে দিয়ে এস।" আমি হতভম্ব হইয়া তখনই ফল-মিষ্টির অর্দ্ধেক ঠাকুরঘরে দিলাম, এবং বাকি অর্দ্ধেক মহাপুরুষজীর নিকট আনিলাম। তখন তিনি শান্ত হইলেন।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

[চার]

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ, Belur P. O.
Howrah Dt.
13.1.18

প্রিয় কা-,

তোমার পত্র পাইয়াছি। মাতৃসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামাতা জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার উপায়—একমাত্র প্রভুর কৃপা, তাঁর স্মরণ-মনন-চিন্তা, তাঁর নামজপ, তাঁর গুণগান, তাঁর পূজা, তাঁর সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠ, তাঁর ভক্তদের সঙ্গ—এই সকল উপায়। অসৎসঙ্গ যতদূর সম্ভব পরিহার—এই এক প্রধান উপায়। সমস্তই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর এবং তাঁর কৃপা তাঁকে কাতরে ডাকলেই হয়। বালকের ন্যায় তাঁর কাছে আবদার করা—ছোটছেলে যেমন মার কাছে কোন জিনিসের জন্য আবদার করে কাঁদে, সেইরকম বালকের সরল হৃদয়ের মত নিজের হৃদয় হইলেই এবং সেইরূপ সরলতার সহিত ডাকিলেই তাঁর কৃপা হয়। যদু বাড়ী আসিয়া তোমাদের সহিত প্রভুর নামে খুব আনন্দ করিয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু তোমাদের খুব ভক্তি-বিশ্বাস দিন, খুব আনন্দে রাখুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
১৬।১।২১

শ্রীমান কা-,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি দেশে গিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এখন জীবন সম্পূর্ণ তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ কর। দীক্ষা সম্বন্ধে আমি যাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম এখনও তাহাই বলিতেছি। যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়া অন্যরূপ দীক্ষা আমি জানি না। ইহা এখন বহু লোকে জানিয়াছে, জানিতেছে ও ক্রমে জানিবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, যুগগুরু, যুগাচার্য্য। তাঁর পবিত্র পতিতপাবন নামই এখন জীবের ভবসাগর তরিবার একমাত্র তরী। তাঁর রূপধ্যান, তাঁর সম্বন্ধে পাঠ, তাঁর গুণকীর্ত্তন, তাঁর শ্রীমূর্ত্তিপূজা, তাঁর ভক্তদের সঙ্গ ও সেবা—এই সকল করিতে পারিলেই জীব পবিত্র হইয়া যাইবে—তার মোক্ষলাভ হইবে, সংসারের অবিদ্যা-বন্ধন কাটিয়া যাইবে। যখন আমাদের (তাঁর সাক্ষাৎ সঙ্গী আমরা) নিকট ইহা শুনিয়াছ ও শুনিতেছ, তখন ঐ দীক্ষা বলিয়া জানিবে ; ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ, ঐ পরমপাবন তারকব্রহ্মনাম, রামকৃষ্ণনামই মন্ত্র বলিয়া জানিবে। অধিক আর কি লিখিব। ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর টিনের হইয়া গিয়াছে শুনিয়া কতই যে আনন্দ হইল, লিখিয়া কি জানাইব। যদুর উপর প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমরাও পবিত্র হইয়া যাইবে কোন সন্দেহ নাই। প্রভুর সেবায় খুব মন দাও। তাঁর কৃপা তোমার উপরও

আছে জানিবে। সু- শ্রীশ্রীমার জন্মতিথিতে ওখানকার আশ্রমে ছিল জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বেলুড় মঠ
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

শ্রীমান কা-,

কিছুদিন হইল তোমার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। মধ্যে এখানে আমি কিছুদিন ছিলাম না। কোন চিন্তা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমাদের পরম কল্যাণ হইবে। যাঁর আশ্রয় লইয়াছ তিনি যুগাবতার, যুগধর্ম্মের সংস্থাপক, সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময়। তোমাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। যদুকেও বলিবে তাহারও পরম কল্যাণ হইবে। যে সহ্য করে সেই কালে জয়ী হয়। তাঁতে নির্ভর অপেক্ষা আর সুখ নাই। সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখিবে। তিনি মঙ্গলময়, নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে ও যদুকেও দিবে। বর্ষা পড়া অবধি আমার শরীরটা তত ভাল যাইতেছে না। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেবঃ — মঠ, বেলুড়, হাওড়া
শ্রীচরণভরসা — ৭।৩।১৯২৫

শ্রীমান কা-,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার পত্রে বড়ই স্বার্থপরতা প্রকাশ হইয়াছে। আশ্রমের অবস্থা তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখন তোমার কিছুতেই আশ্রম ত্যাগ করা উচিত নয়। যদুকে এখন তোমার কিছুতেই ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়। বরং তাহাকে যে-কোনরূপেই হউক সাহায্য করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ঠাকুরের নাম লইয়া আশ্রমেই পড়িয়া থাক—সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক। সুখের সময় অনেক বন্ধু জোটে, দুঃখের সময় সকলেই পলায়ন করে। ভয় নাই, ঠাকুর জীবন্ত দেবতা, আশ্রমের ওরূপ অবস্থা থাকবে না। পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। পলাইবার চেষ্টা করিও না—ভয় নাই। তোমার মনের দুর্ব্বলতা আসিয়াছে; খুব প্রভুকে ডাক, দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইবে। ভক্তদের অধিক বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সরল ভক্তিতে তাঁর কৃপা শীঘ্র লাভ হয়। ভয় নাই, অধৈর্য্য হইও না। ধৈর্য্য ধরিয়া সুখে কষ্টে আশ্রমেই থাক। পালাবার চেষ্টা করিও না—ইহা অত্যন্ত অবিশ্বাসী ও কাপুরুষের লক্ষণ। ভয় নাই—আশ্রমের অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হইবে তাঁর কৃপায়। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে ও যদুকে জানাইবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
১৭।৪।২৫

শ্রীমান কা-,

দিন কয়েক হইল তোমার পত্র পাইলাম। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার জন্য উত্তর দিতে পারি নাই। আশ্রমের ছেলেগুলির কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে, তুমিও জানিবে, যদুকেও দিবে। আমার এখন ঢাকা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তোমার ব্রহ্মচর্য্য স্বামীজীর জন্মোৎসবের সময় হইতে পারে, এখন নয়। সংসারের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কোন চিন্তা করিও না। ঠাকুরের কৃপায় কখন সংসারে বদ্ধ হইবে না। প্রাণ ভরিয়া তাঁর নাম কর আর প্রার্থনা কর—তিনি তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। আশ্রমের কাজ প্রাণ দিয়া করিবে। ঠাকুরের সেবা যতদূর সম্ভব করিবে। ঠাকুর সেবায় বড়ই তুষ্ট হন। যাহা করিতেছ আমারই সেবা করা হইতেছে, নিশ্চয় জানিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা সকলে সুস্থ শরীর ও মনে আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত থাক ও তাঁর নামজপাদি করিয়া শান্তিতে থাক। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেবঃ শ্রীচরণভরসা — Math, Belur 2/5/25

শ্রীমান কা-,

তোমার কার্ড পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার এই যে কাঞ্চনাসক্তি চলিয়া গিয়াছে এবং কামাসক্তি কমিয়া গিয়াছে—এ কি কম ভাগ্যের কথা! তাঁহার কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিও। ও যা একটু-আধটু কাম আছে, শরীর থাকলেই ওরকম একটু-আধটু থাকে। তাও তাঁর চিন্তা করিতে করিতে ও-সব চলিয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই। তাঁর শরণাগত হইয়া ধ্যান, জপ, প্রার্থনা, স্মরণ, মনন করিতে থাক, তা হলে কাম-টাম যাওয়া তো তুচ্ছ কথা, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে বিরাজ করিবেন। শ্রীমান যদু বাবুর অসুখের জন্য চিন্তিত ছিলাম। তিনি কতকটা ভাল আছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ভাল হয়ে যাবেন, ভয় নাই। তাঁর এইসব দুঃখ বিপদ কাটিয়া যাউক—এই প্রার্থনা করি। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং যদু বাবুকে জানাইও। ওখানকার অন্যান্য সকলকেও জানাইও। ইতি—

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
হাওড়া
15/3/26

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার চিঠি পাইলাম। সকলেই যার যা ইচ্ছা করুক, তুমি নিজের বিষয়ে নিজে সতত সাবধান হইবে। ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ—এই সব নিয়মিত করে যেও। কীর্ত্তন কর—এ তো উত্তম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, ভয় কি? তাঁর চিন্তা করিলে সকল দুর্ব্বলতা দূর হয়ে যাবে। তুমি মনে রেখো যে তুমি ভগবান-লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছ এবং তোমার আদর্শ—শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁর চিন্তা ও সেবাই একমাত্র উপায়। খুব আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে যাতে ভক্তি-বিশ্বাস হয় এবং সাধন-ভজনে শক্তি হয়। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। তোমার ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা বর্দ্ধিত হইয়া তাঁর চিন্তা ও সেবা করিবার শক্তি হউক। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং যদুনাথ প্রভৃতি সকলকে দিও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
26/4/27

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়াছি। যদুকে আমি পত্র দিয়াছি। ঠাকুর

তোমাদের যেরূপ অবস্থায় রাখিবেন, সেই অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। তিনি কষ্টে রাখেন, তাহাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া আমার বলিবার কিছু নাই। ঠাকুরের কাছেও প্রার্থনা করি—তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন এবং তাঁর কৃপায় তোমাদের সকলেরই ভক্তি বিশ্বাস নির্ভরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করুক। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৯)

পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দেহাবসানে তাঁহার এক শিষ্যকে মহাপুরুষজী কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাংশ* :

"তোমরা তাঁহাকে চোখে দেখিয়া যে আনন্দ পাইতে, এখন হইতে তাঁহার চরিত্রধ্যানে আরও শতগুণ আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ সদাসর্ব্বদা অনুভব করিবে। যখন ইচ্ছা করিবে, কলিকাতায় নয়, অতি নিকটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন পাইবে। কোন ভয় নাই। তাঁহার শরীরত্যাগে ঠাকুরের কৃপায় তিনি তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন।"

* 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত।

(১০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
6-6-28

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তুমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ—সংবাদে আনন্দিত হইলাম। ঝড় বৃষ্টি তুফানের মধ্যে ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন—সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইল্যম। ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে। তিনি তোমাদের সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আমার শরীর একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং যদু প্রভৃতিকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
24.7.28

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আমার শরীর কৈ তেমন খারাপ হয় নাই—যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। তোমায় ঠাকুর কি দেখাইয়াছেন তিনিই জানেন। যদুর বিপদ

ঠাকুরের কৃপায় অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ভক্তকে তিনি নিশ্চয়ই দেখেন। চাই ভক্তি-বিশ্বাস। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণ করিবেন। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
6.10.28

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের কাজ করছ এ তো খুব ভাল কথা। তাঁর কাজ করছ, আর তিনি তোমাদের ভুলে যাবেন, তা কি হয়? তাঁর কৃপা তোমরা এ জীবনেই অনুভব করবে। তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—তিনি ভক্তি-বিশ্বাস নিশ্চয়ই দিবেন। তাঁর কৃপায় কল্যাণ হইবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় চলে যাচ্ছে। মঠের সব কুশল। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
30.7.29

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি যে সব কাজকর্ম্ম করিতেছ তাহাও ঠাকুরের কাজ। অতএব তোমার এতে কিছু ক্ষতি হইবে না। বাকী সময় যে টুকু পারবে ধ্যান জপ করিবে। তাতেই তোমার হয়ে যাবে। চির-পবিত্র থাকিবে এবং সাধন-ভজন করিবে—কোন ভয় নাই। তিনিই তোমাদের দেখছেন, দেখবেন এবং রক্ষা করিবেন। তাঁর উপর তোমার ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তোমার এখানে আসার কোন প্রয়োজন এখন নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
6.10.29

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি এক স্থানে থেকে ভগবানের নাম কর, পরে এর ফল বুঝতে পারবে।

তোমার কোন চিন্তা নাই। মনের এই চাঞ্চল্যটুকু দূর করতে যদি না পার তো ভগবানের দিকে মন দিবে কি করিয়া? প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। আমার শরীর ভাল নয়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন—জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস দিন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
23/11/29

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বাপু নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করেই তো যত গোলমাল করছ। এক স্থানে দিন কতক চুপচাপ বসে তাঁর কাজ ও ধ্যান-জপ করে দেখনা, কি হয়। কিছু করবে না আর ঘোরাঘুরি করবে—মন স্থির কি অমনি হবে? চাঁদপুর থেকে বৎসরাবধি নড়বে না—এখানে থেকে ভগবানের নাম কর। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math
Dt. Howrah
21/2/30

শ্রীমান মণি - ,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বাবা, তোমার উপর ঠাকুরের ও মার খুব দয়া। তুমি নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাইবে। স্বপ্ন ইত্যাদি দেখা প্রকৃতি হিসাবে হয়। ঐসব দর্শন হইলে যে তুমি অগ্রসর হচ্ছ তাহা নয়। তাঁর কৃপার লক্ষণ হচ্ছে হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি, বিশ্বাস এবং আনন্দ। এইগুলি থাকিলে তাঁর দর্শন সময়ে নিশ্চয় পাইবে। হৃদয়-মনের ঐরূপ অবস্থাই মূল—ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। সেজন্য খুব প্রার্থনা করিবে ও তাঁকে ডাকিবে, বাদবাকী প্রভু তোমাদের সব দিবেন।

উচ্চৈঃস্বরে জপ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। সময়ে সময়ে ঐরূপ হয়। আপনা-আপনি ঐভাব চলিয়া যাইবে। ঠাকুরের পূজা করিবে, এ তো খুব ভাল কথা। তিনি তোমাদের ইষ্ট, ভগবান; তাঁর পূজা করিবে—এতে কি আর কথা আছে? আমি তোমাকে খুব আশীর্ব্বাদ করিতেছি।...আমার শরীর ভাল নয়, তবে ঠাকুর এক-প্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
10/4/31

শ্রীমান প্র- চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের সেবা-পূজা নিয়ে আছ—এতেই তোমার ধ্যান জপ সব হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। তোমার কোন ভাবনা নাই—দুঃখিত হইও না। যদুর সব খবর পাইলাম, তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ঠাকুরের কৃপায় সুস্থ হইয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। মঠের অন্যান্য সব কুশল। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ঠাকুর তোমার প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য খুব বৃদ্ধি করুন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
15/17/31

শ্রীমান প্র- চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরকে যখন ধরে আছ,

যেখানেই থাক না কেন তোমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। গ্রামের লোক ঐরূপ বলেই তো তাদের মধ্যে থেকে জীবন দেখিয়ে তাদের সৎপথ দেখাইবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের জীবন দেখে তাদের পরিবর্ত্তন হবে। পরে ওরা সব বুঝবে—ঠাকুরের কৃপায় কোন চিন্তা নাই। যদু একসঙ্গে কতকগুলো কাজ জুটিয়েছে; কোনটা ভালভাবে হয় না, আর লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। কি আর করি বল—তিনি তাকে যেমন বুদ্ধি দিচ্ছেন সে সেরূপই তো করবে। আমার শরীর ভাল নয়, খুবই খারাপ। দু'দিন হইল একটু আমাশয়ের মত হইয়াছে। তাঁর কৃপায় সেরে যাবে—কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা তুমি, যদু প্রভৃতি সকলে জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
2/9/31

শ্রীমান প্র- চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যেভাবে তাঁর সেবা পূজা করিতেছ তাহাতেই তোমার সব হইয়া যাইতেছে। সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্য কিছুই কিছু নয়, যদি তাঁতে ভক্তি-বিশ্বাস থাকে। তোমার

তাঁর কৃপায় তা আছে; অতএব তোমার ভাবনা কি? আমার শরীর তাঁর কৃপায় আজকাল একটু ভাল আছে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
2. 11. 31.

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। তাঁকে ধরে থাক, তাঁর কৃপায় তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে। তাঁকে যে একবারও আন্তরিক ডাকে, তার কোন ভাবনা নাই, জানিবে। তিনি তাদের রক্ষা করিবেনই।

আমার শরীর ভাল নয়, তবে ঠাকুর একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন।

তোমরা সব কুশলে থাক এবং তিনি তোমাদের প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন, প্রার্থনা করি। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
22. 12. 31.

শ্রীমান প্র-চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নিজের দোষ-ত্রুটি যখন বুঝিতে পারিতেছ, তখন আর ভাবনা কি? তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে, তিনিই দূর করে দিবেন। সব মানুষেরই দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে সেইগুলি ধরে না থেকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করতে হয়। তা হলেই আপনা হইতে উহারা চলে যায়।

তোমার যখনই ইচ্ছা হইবে ও সুবিধা হইবে আসিবে। আমার শরীর ভাল নয়। প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের কুশলে রাখুন। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

(২২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
হাওড়া
৫।৯।৩২

শ্রীমান র-,

...গুরু ও ইষ্টমূর্ত্তি সজীব ও মূর্ত্ত—এই ভাবে ধারণা করিয়া হৃদয়পদ্মে বা সহস্রারে তাঁহার আসন দিয়ে চিন্তা করিতে হয়। ইষ্টনামের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা করিলে একসঙ্গে ধ্যান জপ উভয়ই হয়। স্বতন্ত্র চিন্তাও করা যায়। সহস্রার ও হৃদয়পদ্মে যার যেমন সুবিধা হয়। গুরুর মূর্ত্তির একটু চিন্তা ও প্রার্থনা ক'রে জপে বসিতে হয়। অভ্যাস করিতে করিতে সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। আন্তরিকতা ও অভ্যাসের দরকার। ইষ্ট শেষে নাম-রূপের পারে কারণরূপ উপাধিরহিত ব্রহ্মে লীন হন। নাম-রূপের রাজ্যে ইষ্টমূর্ত্তিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তিনিই দেখিয়ে দেন—নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই নামরূপ ধরিয়া জগৎ হইয়াছেন। কোন চিন্তা নাই—ঠাকুরের স্মরণ মনন কর, তিনিই সব জানিয়ে দিবেন।...

ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

ওঁ

বারাসত-তীর্থ-বন্দনা

জয় জয় জগদীশ মঙ্গলনিধান।
রামকৃষ্ণরূপে তুমি এলে ভগবান ॥
জয় জয় মহামায়া জগত জননী।
রামকৃষ্ণ-শক্তিরূপা চৈতন্যদায়িনী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
অবনী লুটায়ে বন্দি সবার চরণ ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-লীলা সহচর।
অন্তরঙ্গ, যোগিবর, করুণাসাগর ॥
জয় শিবানন্দ জয় গুরুগতপ্রাণ।
শ্রীমহাপুরুষ সদা বালক সমান ॥
তেজঃ পুঞ্জকায় তাঁর রূপ মনোহর।
আজানুলম্বিত বাহু সুঠাম সুন্দর ॥
অপূর্ব্ব সংযম, ত্যাগ, তপস্যা কঠিন।
সহজ সরল ভাব, আড়ম্বরহীন ॥
গুরুরূপে কত জীবে করিলা উদ্ধার।
গুরু-অভিমান তবু না ছিল তাঁহার ॥
চব্বিশ পর্গণা জেলা গ্রাম বারাসতে।
তাঁর জন্ম হ'ল এই ঘোষাল বাড়ীতে ॥
শুন ভাই, এই জেলা নহে সাধারণ।
প্রভু-লীলাসহচর আর পাঁচ জন ॥ *
লভিলা জনম তার বিভিন্ন গ্রামেতে।
জেলার মাহাত্ম্য কত বাড়িল ইহাতে ॥

---

* ১। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী—শিকরা-কুলিন গ্রাম, ২। স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী—রাজারহাট, (বিষ্ণুপুর), ৩। স্বামী যোগানন্দজী—দক্ষিণেশ্বর, ৪। স্বামী অদ্বৈতানন্দজী—জগদ্দল (রাজপুর), ৫। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী—পইহাটীর নওরা গ্রাম।

নমি শ্রীতারকনাথ, যাঁহার কৃপায়।
তারকের আবির্ভাব হইল হেথায়
শিবের বরেতে হ'ল শিবের উদয়।
জয় গুরু মহারাজ জয় গুরু জয়॥
তাঁর আবির্ভাবে তীর্থ হ'ল এই গ্রাম।
অবনতশিরে মোরা করিগো প্রণাম॥
পবিত্র এ তীর্থরেণু ধরিয়া মাথায়।
ভক্তবৃন্দ! এস মাতি কে আছ কোথায়॥
ধন্য পিতৃদেব তাঁর শ্রীরামকানাই।
যাঁহারে করিলা কৃপা জগৎ-গোঁসাই॥
ধন্য মাতা, ধন্য কুল, আত্মীয় স্বজন।
ভক্তিভরে বন্দি মোরা সবার চরণ॥
সুবৃহৎ জলাশয়, পথ, ঘাট, মাঠ।
প্রাচীন সে বিদ্যালয়, গ্রামে বড় হাট॥
বৃক্ষলতা, গুল্ম আদি ভদ্রাসন ঘর।
তাঁহার পরশ পেয়ে হইল অমর॥
কুলের দেবতা যিনি নমি তাঁর পায়।
গ্রামের দেবতা বন্দি যে আছ যথায়॥
করযোড়ে বন্দি মোরা গ্রামবাসিগণ।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ ধরিয়া চরণ॥
কর আশীর্ব্বাদ সবে জানাই মিনতি।
অচলা ভকতি রহে ইষ্টপদে মতি॥
এই মহাতীর্থস্থান করি দরশন।
পবিত্র হইল তনু শুদ্ধ হ'ল মন॥
জীবন, জনম হ'ল সার্থক আমার।
তীর্থরাজ! লহ লহ কোটি নমস্কার॥

—সাধুভক্ত